Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ভূত সমগ্র

আহসান হাবীব

বইঘর

আহসান হাবীব রম্য লেখক বলেই হয়ত মাঝে মধ্যেই রম্য টাইপের ভূতের গল্প লিখে থাকেন। তবে তার এবারের সংকলনটিতে সব সিরিয়াস টাইপের ভূতের গল্প সংকলিত হয়েছে। পুরানো গল্পের সঙ্গে বেশ কিছু নতুন গল্পও রয়েছে এই সম্পূর্ণ ভৌতিক সমগ্রে। ভয় পেতে চায় এমন পাঠকরা বইটি গভীর রাতে পড়লে মনে হয় সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যেতেও পারেন। লেখকের তাই ধারণা।

প্রচ্ছদ - ধ্রুব এষ

ভূতসমগ্র

আহসান হাবীব

ভূত সমগ্র

আহসান হাবীব

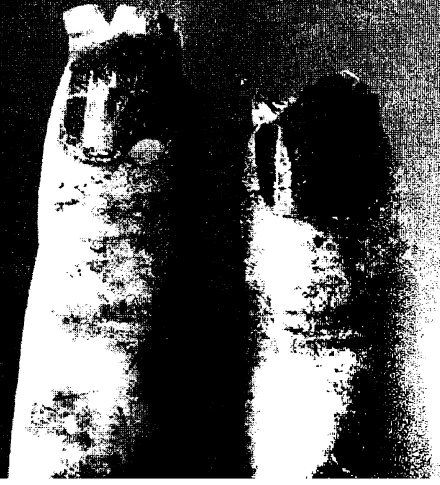

শুভ্র প্রকাশ

ভূত সমগ্র

আহসান হাবীব

প্রকাশনায়
শুভ্র প্রকাশ, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০১৯১১৭৪৫১৫৭

প্রকাশক
শুভ্র শ্যাম

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৩ইং

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

স্বত্ব
লেখক

বর্ণবিন্যাস
এম. হক কম্পিউটার্স

বাঁধাই
মোকাদ্দেস বাইন্ডিং

মুদ্রণে
ঢাকা প্রিন্টার্স

মূল্য
২৭০ টাকা মাত্র।

ISBN : 978-984-8881-50-4

Bhut Samagro : Ahsan Habib, Published by Shuvro Shyam. Shuvro Prokash, 45 Banglabazar, Dhaka-1100. First Published-Ekushe Boimela, 2013. Price : 270 Tk. Only.

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উ ৎ স র্গ

মেয়ে এষা, তিথি...

ভূত সমগ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

ভূ(ত)মিকা

ভূত নিয়ে যত লেখা লিখেছি তারমধ্যে মনে কমেডি টাইপ ভূতের গল্পের সংখ্যাই বেশি। এটা অবশ্য সিরিয়াস টাইপ ভূতের লেখকরা ভাল ভাবে নেন নি।...আমি অবশ্য তাদের সাথে একমত। ভূতকে তার রহস্যময় জায়গায় রহস্য নিয়েই থাকতে দেয়া উচিত। সেখানে ফান ঢোকানো ঠিক না। তাই এই সংগ্রহে আমার লেখা যত সিরিয়াস টাইপ ভূতের গল্প আছে সেগুলো জুড়ে দিয়েছি। নতুন পুরাতন মিলে আশা করছি সংকলনটি খুব খারাপ হবে না। (সাথে নিজের আঁকা ফ্রি ছবিতো থাকছে!)

আহসান হাবীব
পল্লবী, ঢাকা।

সূচিপত্র

১১ # বদলা
২১ # দাগী জয়নাল
২৬ # ভয়!
৩১ # বীথির ভয়
৩৫ # জৈতুন
৪৩ # আদনান সাফির মা
৪৯ # পায়ের ছাপ
৫৫ # লিফট
৬১ # স্কুল ভ্যান
৬৮ # মায়া
৭৭ # পাইরেটস
৮৫ # দ্বিতীয় পক্ষ
৮৯ # ছাপাখানার ভূত
৯২ # সঙ্গী
৯৬ # পূর্ণ ভূত
১০২ # দেয়ালের মানুষ
১০৭ # কবর
১১২ # ছেমা আসতাছে
১১৭ # স্বপ্ন
সুরাইয়া # ১২৩
ছুঁচো # ১২৯
ছায়া # ১৩৪
মেছো ভূত # ১৪৩
অসম্ভব # ১৪৯
মতির মিসটেক # ১৫৪
আলতাফ সাহেবের বিদায় # ১৫৯
মুন্নি # ১৬৩
লাজুক ভূত # ১৬৭
জ্বীন # ১৭১
খাটিয়া # ১৭৭
ভুতুড়ে বাড়ি # ১৮১
পাথর # ১৮৫
পেত্নী # ১৯০
বিড়াল # ১৯৫
মাউস # ২০০
অন্য কেউ # ২০৪
ধলা # ২১০

বদলা

ভূত আছে দুই কিসিমের... খারাপ আর ভাল।

আমি খারাপ ভূত হইতে চাই।

খারাপ ভূত হওয়াই কঠিন...

সাধুজী আমার একটা ব্যবস্থা কইরা দেন যেমনে হউক... আমার খারাপ ভূত হইতেই হইব।

হুঁম্... কঠিন কাজ। বৃদ্ধ সাধুকে বিশেষ চিন্তিত মনে হয়। 'প্রেত সাধনা করছি প্রায় ষাইট বছর। তোমার মতো এই রকম কেউ আসে নাই ... ভূত হইতে চায়!' বৃদ্ধ হাসে।

সাধু বাবা, একটা ব্যবস্থা করেন।

খারাপ ভূত হইতে হইলে খারাপ মানুষ হইতে হয়। তুমি মানুষ কেমন আছিলা?

জি মানুষ ভালই আছিলাম। বিয়া-সাদি করি নাই। স্কুলে অংক পড়াইতাম। কারো সাত পাঁচে ছিলাম না কখনো। হঠাৎ চেয়ারম্যান সাহেব আইসা একটা ফলস মার্ডার কেসে আমারে ফাঁসায়া জেলে ঢুকায়া দিল। ফাঁসিই হয়া যাইত। যাবজ্জীবন হইল...সবই তো আপনারে বলছি সাধু বাবা...

আমাকে সাধু বাবা বলবানা। কতবার বলছি?

তা হলে কি বলব?

বাসু তান্ত্রিক বলো ... আমি বাসু তান্ত্রিক প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়েছি ত্রিশ বছর বয়সে...সেই শুরু ...যাহোক তোমার ঘটনাটা আবার বলো...

তারপর মিথ্যা কেসে চৌদ্দ বছর জেল খাটলাম। বাইর হয়া আইসা দেখি আমার জমির উপর চেয়ারম্যান সাহেবের আলিসান চারতলা বাড়ি...তাই ভাবলাম প্রতিশোধ নিব। মানুষ হইয়া পারব না। আমার কোন ক্ষমতা নাই ... ভূত হইয়া প্রতিশোধ নিব ...

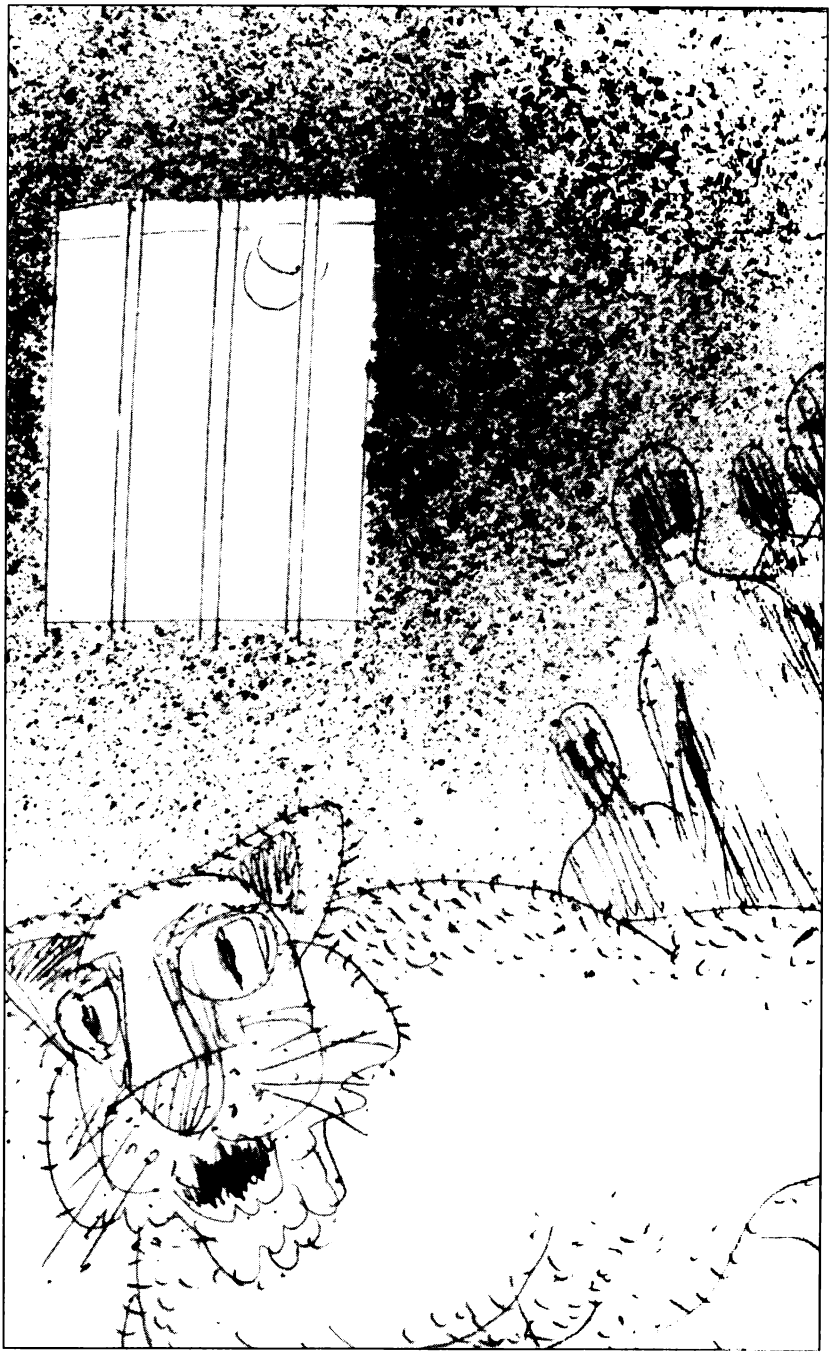

হুঁম্... তোমার বুদ্ধি খারাপ না... কিন্তু ঐ যে কঠিন কাজ ...খারাপ ভূত হওয়া সত্যিই কঠিন।

সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসা। আপনি যেমনে বলেন।

দেখি তোমার করতল দেখাও।

জি! মানে?

মানে ডান হাত দেখাও। তোমার রেখা বিচার করব।

আমিনুর রহমান ডান হাত পাতে। বাসু তান্ত্রিক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে তার করতলের দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে।

সাধু জী... ইয়ে বাসু তান্ত্রিক, কি বুঝলেন?

তোমার শিরো রেখা যেইখানে পশুভাব আর মনুষ্যভাবকে আলাদা করছে ... তাতে করে বুঝা যায় তোমার মধ্যে মনুষ্যভাব প্রবল...

জি বুঝলাম না।

মনুষ্যভাব কমায়া পশুভাব আনতে হবে তোমার মধ্যে ... নাইলে হবে না। খারাপ কাজ করতে হবে তারপর আত্মঘাতি হইবা... কি পারবা?

অবশ্যই পারব... পারার জন্যই তো আপনার কাছে আসছি...

তাইলে যাও পরশু রাত মাঘি পূর্ণিমার রাত ... ঠিক বারোটায় চইলা আসবা এই খানে...খালি পেটে আইবা... পেটে যেন ক্ষুধা থাকে... তীব্র ক্ষুধা...

জি আচ্ছা...

বাবা আসব?

কে জুনায়েদ? কি খবর? আয়।

আজগর সাহেব তার এই ছেলেটাকে একটু সমীহ করেন ভিতরে ভিতরে। বাইরে অবশ্য বুঝতে দেন না সেটা। জুনায়েদ সাংবাদিকতা করে, আবার মানবাধিকার বিষয়ক ছোট বড় নানান কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে তার আগ্রহ, কয়েকদিন ধরে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থাকে অবশ্য ঢাকায়। ঢাকায় আজগর সাহেবের দুটোফ্ল্যাট আছে, একটা ধানমণ্ডিতে, একটা বারিধরায়। তিনি থাকেন ধানমণ্ডিরটাতে। যখন চেয়ারম্যান ছিলেন তখন বেশির ভাগ সময় গ্রামেই থাকতেন। এম পি হওয়ার পর থেকে অবশ্য রাজনৈতিক কারণেই ঢাকাতেই থাকতে হয়। এবার অবশ্য একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে দু দিনের জন্য সবাইগ্রামের বাড়িতে এসেছেন।

বাবা !

হ্যাঁ ... বলো ।

তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা ছিল ।

বলো ।

আমিনুর রহমান নামে তুমি কাউকে চিন?

মানে ? ভ্রু কুচকে যায় আজগর সাহেবের । 'আমিনুর কে?'

এই গ্রামের স্কুলের একজন অংকের টিচার ছিল । ভাল লোক ছিল । আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে তাকে মিথ্যা খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ঢোকানো হয় । মনে পড়েছে?

আজগর সাহেব ঢোক গিলেন ।

তুমি এসব তথ্য কোথায় পেয়েছ?

গত সপ্তাহে আমিনুর রহমান ছাড়া পেয়েছে। তার জায়গার উপর আমাদের এই বাড়িটা তুমিই বানিয়েছ, আমিনুর জেলে ঢোকার পর পর...মনে পড়েছে ?

এম.পি.আজগর সাহেবের চোয়াল শক্ত হয়ে আসে ।

জুনায়েদ, তুমি কিন্তু সীমা অতিক্রম করছ... যা বোঝ না...

বাবা ... আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমার মুখে থুথু ফেলতে... তুমি কি খুব মাইন্ড করবে?

এসব কি হচ্ছে? ছি ছি তুই এসব কি বলছিস জুনায়েদ...?

আজগর সাহেবের স্ত্রী ছুটে এসে জাপটে ধরেন তার ছেলেকে। জুনায়েদ শক্ত হাতে মার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। ফ্যাকাশে হয়ে বসে থাকেন এম পি আলহাজ্ব আজগর সাহেব ।

ওগো, ও যা বলল এসব কি সত্যি?

বাসু তান্ত্রিক, আমি আসছি ।

ক্ষুধা নিয়া আসছ তো?

জি । খামু কই? জেল থাইকা বাইর হয়া আমিতো ফকির ... কোথাও কেউ নাই...

হুঁম্ ... এই নাও ।

এইটা কি?

একটা ভোজালি...রামদাও বলতে পার ।

এইটা দিয়া কি হবে?

boighar.com

এইটা নিয়া ঐ জঙ্গলে ঢুইকা যাও ... একশ হাতের মধ্যে যদি কোন পশু পাও খুন করবা, কি পারবা না?

কি কন পশু খুন করব?

হ্যাঁ পশুভাব আনতে হবে নিজের মধ্যে।

না, আমি পারব না।

তাহলে এক্ষনি বিদায় হও...

আচ্ছা দেন পারব, আমাকে পারতে হবে। ভোজালিটা হাতে তুলে নেয় এক সময়েরঅংকের তুখোর শিক্ষক আমিনুর রহমান। ' একশ হাতের মধ্যে মধ্যে যদি কোন পশু না পাই...?'

পাইবা... অবশ্যই পাইবা... প্রেতযোনী প্রাপ্ত প্রেত সাধক আমি... বাসুদেব তান্ত্রিক... আমার কথা মিথ্যা হবে না... তারা পশু... ভয়ঙ্কর সব পশু...মনে রাখবা এরা পৃথিবীর পশু না, অন্য জগতের...যাও এখনি যাও...

আকাশে পূর্ণ চাঁদ। নির্জন জঙ্গলের উপর ঝক ঝক করছে তার আলো। হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় দুলে উঠছে বনভূমি। ...প্রচণ্ড ক্ষুধা, জেদ আর অস্পষ্ট আতঙ্কনিয়ে আমিনুর রহমান ঢুকলোজঙ্গলে। দু হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে ভোজালি ... একশ গজের মধ্যে যেই আসে তাকে এই ভোজালি দিয়ে হত্যা করতে হবে। কে আসবে? কেমন পশু তারা? ধ্বক ধ্বক করে আমিনুরের বুকটা... সাধু সব সত্যি বলছে তো...?

ঠিক তখন দেখা গেল হেঁটে আসছে একটা বাঘ ... এই জঙ্গলে বাঘ ? কোথা থেকে ?আমিনুর রহমানের সামনে বাঘটা শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা পোষা বেড়ালের মত শুয়ে গা রগরালো কিছুক্ষণ জঙ্গলের অন্ধকার ঘাসে। গাছের ফাঁক দিয়ে যতটা চাঁদের আলো ঢুকে তাতে আমিনুর লক্ষ্য করল বাঘটা আসলে ঠিক বাঘ না, জেব্রার মত একটা প্রাণী যেটা আস্তে আস্তে ঘোড়া হয়ে যাচ্ছে ... হঠাৎ কি হল আমিনুরদু হাত তুলে ভোজালিটা চালাল তার গলা বরাবর...ফিনকি দিয়ে ...রক্তই হবে ব্যাপারটা, ভিজিয়ে দিলে আমিনুরকে !

একসময় আমিনুরকে রক্তাক্ত ভোজালি হাতে টলতে টলতে বের হয়ে আসতে দেখা গেল।

সাবাশ! তোমার মধ্যে পশু ভাব আসতেছে... তুমি পারছ... এইবার আমারে কোপ দাও... এই যে আমার গলা বরাবর।

বাসু তান্ত্রিক গলা বাড়িয়ে দেয়।

আমিনুর জানতে চায়–

কি বলছেন...?

ঠিকই বলছি... জলদি করো... সময় কিন্তু নাই... চাঁদের আলো থাকতে থাকতে... যা করার করতে হবে।

তারপর আমার কি হবে?

তুমি যা হইতে চাইছ ... তাই ...প্রতিশোধ নিবা না? ঐ যে আজগর তোমারেপিতৃভূমি ছাড়া করছে...? মারবা না তারে?

মারব অবশ্যই মারব।

কি-কিন্তু আ-আমি আপনারে মারতে পারব না...

অবশ্যই পারবা ... পারতেই হবে... জলদি করো ...সময় নাই কিন্তু। ভয়ঙ্কর গলায় বলে বাসু তান্ত্রিক।

আমিনুর আর দেরি করে না চোখ বন্ধ করে ভোজালিটা শূন্যে উঠায় দ্বিতীয় বারের মত।ছিটকে পড়ে বাসুদেব এর ছিন্ন মাথাটা...খল খল করে হেসে উঠে ... বিশ্রি পঁচা গন্ধ চারিদিকে ... বমি চলে আসে আমিনুরের। ভোজালি ফেলে মাটিতে শুয়ে ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে থাকে আমিনুর,প্রায় দুদিন না খাওয়া... কিছুই নেই তার পেটে... তারপরও হর হর করে বমি হচ্ছে... বিশ্রি পুঁতি গন্ধময় ... !

ছাদে হাঁটছেন আজগর সাহেব, আজই ঢাকা ফিরে যাবেন।সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তার মেজাজ ভাল নেই। ছেলেটা ভাল ঝামেলা পাকিয়েছে। চৌদ্দ বছর আগের কেসনিয়ে জল ঘোলা করছে। তিনি কি করবেন বুঝতে পারছেন না। সকাল থেকে সে নেই, ঢাকা চলে গেছে নাকি। আরেকটা খবর তার কানেএসেছে। পাকা খবর আমিনুর জেল থেকে বের হয়ে আত্মহত্যা করেছে কিংবা তাকে কেউ হত্যা করেছে। উত্তরের জঙ্গলে তার লাশ পাওয়া গেছে। ছিন্ন ভিন্ন লাশ। কেউ তাকে কুপিয়ে মেরেছে। কে হতে পারে? তবে তিনি নন। চেয়ারম্যান সাহেব ভাল আছেন?

চমকে পিছন ফিরে তাকায় আজগর সাহেব। তাকে চেয়ারম্যান বলে আর কেউ ডাকে না। সবাই বলে এমপি সাহেব।

কে?

boighar.com

আমি আমিনুর...

হতচকিয়ে যান আজগর সাহেব। আমিনুর যে মারা গেছে... পাকা খবর। তাহলে এ কে?

তু-তুমি?

জি আমি ছিলামএকজন অংকের শিক্ষক... মনে পড়ছে?

কি চাও?

কিছু চাই না। দেখতে আসলাম আপনারে ...বলে এগিয়ে আসতে থাকে আমিনুর। প্রচণ্ড আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

কি ক্কি চাও?

কিছু চাই না। দেখতে আসলাম আপনারে ... এগিয়ে আসতেই থাকে আমিনুর। আজগর সাহেব হঠাৎ খেয়াল করেন তিনি যেদিকটায় রেলিং নেই সেদিকে পিছাচ্ছেন ... 'এই কে আছ ?' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলেন তিনি, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। ফাটা বাঁশের মত ফ্যাশফ্যাশে একটা আওয়াজ হল...এগিয়ে আসছে রহস্যময় লোকটা... লোকি সত্যিই আমিনুর?... চারিদিকে একটা পঁচা গন্ধ...হঠাৎ পা হড়কাল তিনি তাল সামলানোর চেষ্টা করলেন, পারলেন না ...ঝপ করে তলিয়ে গেলেন নিচে...!

ধরমর করেউঠে বসেন আজগর সাহেব। 'কি হল তোমার?' স্ত্রী সালমা বেগম অবাক হয়ে তাকান।

এ-একটা বাজে স্বপ্ন দেখলাম।

কি দেখলে?

দেখলাম আ-আমি ছাদ থেকে পড়ে গেছি...

টেনশনে থাকলে মানুষ এ ধরনের স্বপ্ন দেখে। তখনি বলেছিলাম অবেলায় ঘুমাইওনা। বরং তুমিঢাকা ফিরে যাও।

তোমার ছেলে কই ?

ও চলে গেছে।

না বলেই চলে গেল?

তাইতো গেল। মাথায় যে কীভূত চেপেছে!

সেই ভাল। ঢাকা যাই। তুমি যাবা না?

আমি কাল আসব। আরেকটা গাড়ি তো আছে এখানে।

হুঁম্ তাহলে যাই ...এখানে আমার ভাল ঠেকছে না। গাড়ি বের করতে বল ...এখনি...

সাড়ে সাতটার দিকে আজগর সাহেব গাড়ি নিয়ে বের হলেন একাই...। তার গ্রাম থেকে ঢাকা খুব দূরে নয় তিন ঘণ্টার পথ। জ্যাম থাকলে চার ঘণ্টা। তবে আজ মনে হয় জ্যাম হবে না। আকাশে মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ। দু দিকে ধান ক্ষেত হু হু করে ছুটছে আজগর সাহেবের টয়োটা হাইস মাইক্রোবাসটি। ড্রাইভার সেলিম দক্ষ চালক।

আজগর সাহেবের একটু ঝিমানোর মত এসছিল হঠাৎ আবিষ্কার করলেন। গাড়ি থেমে আছে।

কি হল সেলিম?

একি সেলিম নেই! গাড়ি থেমে আছে একটা খোলা প্রান্তরে। জায়গাটা আজগর সাহেবের পরিচিত ...এখানেই নাকি আমিনুরের লাশ পাওয়া গেছে। 'এই সেলিম, তুই কই?'

স্যার এই যে...ইয়ে করতাছি... খুব চাপ ধরছিলতো...

আজগর সাহেব হতভম্ব হয়ে দেখেন। ড্রাইভার সেলিম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট কাজ করছে। দৃশ্যটা কুৎসিত। আর তার এতটা সাহস হওয়ারও কথা নয়... তার সামনে এভাবে...

এই হারামজাদা ...?

আজগর সাহেবকে পাত্তা না দিয়ে কেমন এক ভঙ্গিতে হেসে উঠে সেলিম ড্রাইভার। আজগর সাহেব তার ব্যক্তিগত পিস্তলটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসেন। এসব হচ্ছেটা কি? এ সময় তিনি খেয়াল করলেন সামনের জঙ্গলটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে অনেকগুলো মানুষ বের হয়ে আসছে। এরা কারা ?

'স্যার, গাড়িতে উঠেন জলদি ...' আজগর সাহেব তাকিয়ে দেখেন গাড়িতে বসে আছে সেলিম, গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে সে...সামনে প্রসারিত হেড লাইটের আলো। তিনি ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে গেলেন যেই...সেলিম টান দিয়ে গাড়ি সরিয়ে নিল ...যেন তার সাথে রসিকতা করছে সে।

boighar.com

এই হারামজাদা, কি করছিস...?

সেলিম কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে... 'স্যার ঐ দেখেন... দেখেন...!'

আজগর সাহেব তাকিয়ে দেখেন একটু আগে যাদের মনে হচ্ছিল অনেকগুলো মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে তারা আসলে মানুষ না, ছোট ছোট পায়ের কেমন অদ্ভুত সব প্রাণী! তাকে ঘিরে এগিয়ে আসছে তারা ...বৃত্তটা ছোট হচ্ছে আস্তে আস্তে ... তিনি হঠাৎ ওদের লক্ষ করে দু রাউন্ড গুলি করলেন... কেঁপে উঠল শান্ত বনভূমি...প্রাণীগুলো হুটোপুটি করে বৃত্ত ভাংলো। তারপর আবার এগিয়ে আসতে লাগলো আগের মত...

চেয়ারম্যান সাহেব, ভাল আছেন?

চমকে পিছন ফিরে তাকায় আজগর সাহেব। তাকে চেয়ারম্যান বলে আর কেউ ডাকে না। সবাই বলে এমপি সাহেব।

কে ?

আমি আমিনুর...

হতচকিয়ে যান আজগর সাহেব। আমিনুর যে মারা গেছে পাকা খবর। তাহলে এ কে?

তু-তুমি ?

জি আমি ছিলামএকজন অংকের শিক্ষক... মনে পড়ছে?

কি চাও?

কিছু চাই না দেখতে আসলাম আপনারে ...বলে এগিয়ে আসতে থাকে আমিনুর। প্রচণ্ড আতঙ্কে পিছিয়ে যেতে থাকেন তিনি। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন সন্ধ্যায় দেখা স্বপ্নটা ...এখন ঘটছে। স্বপ্নে ঘটেছিল তার বাসার ছাদে, এখন ঘটছে খোলা প্রান্তরে।

কি ক্কি? চাও?

কিছু চাই না। দেখতে আসলাম আপনারে ... এগিয়ে আসতেই থাকে আমিনুর। আজগর সাহেব হঠাৎ খেয়াল করেন গোল বৃত্ত করে এগিয়ে আসা প্রাণীগুলো থেমে গেছে। তারা আর এগুচ্ছে না ... ' এই কে আছ ?' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলেন তিনি, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। ফাটা বাঁশের মত ফ্যাশ ফ্যাশে একটা আওয়াজ হল...এগিয়ে আসছেলোকটা। লোকটা আসলে কে... ড্রাইভার সেলিম? নাকি আমিনুর

বইঘর.কম

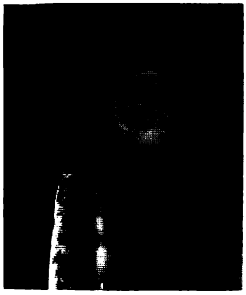

দাগী জয়নাল

জরিনার মা নেই। মার কোন স্মৃতিও নেই। বাবা আছেন তবে এ রকম বাবা বোধহয় না থাকাই ভাল ছিল। জরিনার বাবা একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত সর্দার, দাগী জয়নাল নামে তাকে সবাই এক নামে চিনে। ডাকাতি করতে গিয়ে একাধিক খুন করেছে। কেউ কেউ সন্দেহ করে নিজের বউকেও সে নিজেই খুন করেছে। তবে নব্বই সালের দিকে সে ধরা পড়ে। দ্রুত বিচার আইনের আওতায় পড়ে ফাঁসির রায় হয়ে যায় খুব দ্রুতই!

এসব অবশ্য জরিনা কিছুই জানে না। সে এখনবিবাহিত। জামাই লোকটা ভাল না তারপরও তার মত একজন ডাকাতের মেয়েকে বিবাহ করেছে এটাই তার অন্যতম গুণ। জামাই প্রায়ই তাকে মারধর করে। জরিনা তার জীবনকে মেনে নিয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর সে আকুল পাথারে পড়েছিল তারপর...সে অনেক কাহিনী। বরং আমরা কাসিমপুর জেলখানায় যাই। সেখানে আজ রাতে একটা ফাঁসি হবে। ফাঁসির আসামী এক সময়ের ভয়ঙ্কর ডাকাত সর্দার দাগী জয়নাল।

কাসিমপুর জেলে রাত বারোটায় জেলার সাহেব সাত নম্বর কনডেম সেলের সামনেএসে দাঁড়ালেন।

জয়নাল?

জি স্যার?

জয়নাল শুয়ে ছিল। উঠে এসে গারদ ধরে দাঁড়াল।

এত বছর হল জেলার জীবনে তারপরও এই খবরটা দিতে জেলার মনজুরুল ইসলাম সাহেব একটু ইতস্তত করেন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করেন।

স্যার কিছু বলবেন?

হ্যাঁ...ইয়ে আজ ভোর রাতে তোমার ফাঁসি কার্যকরের হুকুম হয়েছে। মাশআল্লাহ! স্যার আজ শুক্রবার না?

boighar.com

বইঘর.কম

হ্যাঁ

আমার ফাঁসির দিনটা তাইলে ভালই পড়ল কি বলেন স্যার?

হুঁম্ ভাল।

স্যার, দিনটা ভাল কেন বললাম জানেন স্যার?

কেন?

স্যার, ঐ দিনে আমার একটা মেয়েজন্মাইছিল, মেয়ের নাম জরিনা।

সেই মেয়ে কোথায়?

জানি না স্যার। বউ যেদিন জানল আমি ডাকাতি করি সেই দিনই মেয়ে নিয়া ভাইগা গেল।

তারপর?

তারপর আর স্যার খোঁজ রাখি নাই। ভাবলাম গেছে যখন... যাউকগা...কিন্তু আইজ হঠাৎ স্যার মেয়েটারে মনে পড়তাছে। খুব মনে পড়তাছে। কিছু দিন আগে খবর পাইছিলাম মেয়েটার বিয়া হইছে... জামাইটা কেমন কে জানে?

জেলার সাহেবের কেমন একটু মায়াই লাগে। মানব জীবন সত্যি রহস্যময়। মৃত্যুর এত কাছেএসে ডাকাত সর্দারজয়নালেরভিতর কেন আজ হঠাৎ পিতৃভাব এল কে জানে! ...তিনি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিজের অফিসের দিকে রওনা দেন। জয়নাল দাঁড়িয়ে থাকে গারদ ধরে। কে জানে হয়ত মেয়ের কথাই ভাবছে।

ভোর চারটায় জয়নালের ফাঁসি হয়ে গেল। নিজের থেকেই ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে উঠেছিল সে। জেলার সাহেবকে দেখে হাসির ভঙ্গি করেছে ... কালো যম টুপি পরানোর সময় ফিস ফিস করে 'জরিনা জরিনা' বলে নিজের মেয়েকে ডেকেছে বার কয়েক ...ব্যাস এই।

জহুরুলের মেজাজ খারাপ। আজ এক পার্টির টাকা নিয়ে আসার কথা, হারামজাদা আসে নাই। এই নিয়ে তিনবার হারামজাদা কথার খেলাপ করল। তার মানে কি সে টাকাটা মেরে দেয়ার ধান্দা করছে? গঞ্জের দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। হেঁটেই যাওয়া যায়। আজ রিকশা নিল।

বাসা থেকে একটু দূরে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর হাঁটা ধরল। এইটুক রাস্তায় রিকশা ঢুকে না। গলির মত সরুপথ।

আবার বিড়ি খাইছেন?

boighar.com

তোর বাপেরটা খাই হারামজাদী?

জরিনা চুপ করে সরে দাঁড়ায়। আর কিছু বলে না। জহুরুল ঢুকে ভিজে কাপড় বদলায়। তারপর বলে,

খাবার দে জলদি... কি রানছস?

চিংড়ি দিয়া লতি, ভর্তা আর ডাইল।

উফ এক চিংড়ি আর কত খাওয়াবী হারামজাদী?

বাজার না করলে আমি কি করমু?

আবার মুখে মুখে কথা!

জহুরুল ছুটে এসে জরিনার চুলের মুঠি চেপে ধরে। জরিনা বুঝতে পারে তাকে মারার জন্য অজুহাত খুঁজছে জহুরুল। সে চোখ বন্ধ করে...

জহুরুল রীতিমত হাঁপাচ্ছে। যথেষ্ট মারা হয়েছে, অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশিই মেরেছে আজ। জরিনারান্নাঘরে উপুর হয়ে পড়ে আছে।পড়ে থাকুক...

জহুরুল হ্যারিকেন এর আগুনটা উসকে দিয়ে পেপারটা খুলে ধরে চোখের সামনে। পুরোনো পত্রিকা। এক পত্রিকাই সেই কয়েকদিন ধরে পড়ে।

ঠিক কতক্ষণ পেপার পড়ছিল জানে না জহুরুল। তার হিসেবে এক সময় জরিনা উঠে ভাত দিবে। তারপর ফিচ ফিচ করে কাঁদবে। তারপর সব ঠিক। অনেকক্ষণ হল জরিনা উঠে আসছে না। বিষয়টা কি? সে কান পাতে রান্নাঘরের দিকে... নাকোন আওয়াজ নেই... এর মানে আরো মার খাওয়ার শখ হয়েছে হারামজাদীর? সে উঠে গিয়ে রান্না ঘরে উকি দেয়। উঠে বসে আছে পিড়িতে জরিনা।

কি হইল? ভাত দিবি না হারামজাদী?

না। পরিষ্কার ভারি পুরুষ কণ্ঠ একটা। চমকে যায় জহুরুল। হঠাৎ করে মনে হয় ঘরে অন্য কোন পুরুষ ঢুকলো নাকি? না শব্দটা জরিনার মুখ থেকেই বের হয়েছে।

জরিনা উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে দা। ‘ শুওরের বাচ্চা ... আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলস?’ পরিষ্কার ভারী পুরুষ কণ্ঠে বলে জরিনা। হতভম্ব হয়ে যায় জহুরুল। চেঁচিয়ে উঠে, এই জরিনা, কি হইছে তোমার ...?’

তখন প্রথম কোপটা দেয় জরিনা শক্ত হাতে। এক কোপে জহুরুলের বাম হাতটা আলগা হয়ে চামড়ায় ঝুলতে থাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার

দিতেও ভুলে যায়। তার মুখ হা হয়ে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...জরিনা আবার মুখ খুলে।

আমি দাগী জয়নাল ...আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলোস... শুওরের বাচ্চা!

দ্বিতীয় কোপ খাওয়ার আগেই জ্ঞান হারায় জহুরুল।

বছর চারেক পর কাসিমপুর জেলে রাত বারোটায় জেলার সাহেব আবার সাত নম্বর কনডেম সেলের সামনেএসে দাঁড়ালেন।

জরিনা ?

জি স্যার?

জরিনা শুয়ে ছিল। উঠেএসে গারদ ধরে দাঁড়াল।

এত বছর হল জেলার জীবনে তারপরও এই খবরটা দিতে জেলার মনজুরুল ইসলাম সাহেব একটু ইতস্তত করেন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করেন।

স্যার কিছু বলবেন?

হ্যাঁ...ইয়ে আজ ভোর রাতেতোমার ফাঁসি কার্যকরের হুকুম হয়েছে।

স্যার, আজ শুক্রবার না?

হ্যাঁ।

আমার ফাঁসির দিনটা তাইলে ভালই পড়ল কি বলেন স্যার?

হুঁম্ ভাল।

স্যার দিনটা ভাল কেন বললাম জানেন স্যার ?

কেন?

স্যার ঐ দিনে আমার জন্ম হইছিল।

আমি জানি।

কিভাবে জানেন স্যার?

এইসেলে তোমার বাবা জয়নাল ছিল। তারও ফাঁসি হইছিল এই দিনে!

জরিনা অবাক হয়ে জেলার সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কখনো তার ডাকাত বাবাকে দেখেনি ... তার বাবা কি এই জেলার সাহেবের মতন ছিলেন ?

boighar.com

ভয়!

স্যার, রাইতে টয়লেটে যাইতে ডর করে।

কেন?

টয়লেটের ভিতর একটা খারাপ জিনিস আছে স্যার।

খারাপ জিনিস?

জি স্যার, দরজা টান দিয়া ধরে।

মানে?

মানে বাথরুমে ঢুকতে গেলে দরজা টান দিয়া ধরে। আমারে ঢুকতে দেয় না।

কি সব পাগল ছাগলের মত কথা বলছ?

জমির সাহেব তার ড্রাইভারকে ধমক লাগান। ব্যাটা ফাজিল বাড়ি যাওয়ার একটা নতুন ফন্দি বের করেছে। কাছেই বাসা। টয়লেটে খারাপ জিনিস আছেবলে বাড়িতে গিয়ে ঘুম দিবে, কাজের সময় আর পাওয়া যাবে না।

বিষয়টা জমিরুদ্দীন সাহেব ভুলেই গেলেন।ক'দিন পর হঠাৎ দেখেন ড্রাইভার ফজল দাঁড়িয়ে। মাথা চুলকাচ্ছে।

আবার কি হল?

স্যার অভয় দিলে বলি।

ভনিতা না করে কি বলবে বল।

স্যার আজ সকালে উনারা বিদায় নিছেন।

কে?

ঐ যে উনারা আমার টয়লেটেথাকতেন।

খারাপ জিনিস?

ফজল জীভে কামড় দেয়। অর্থাৎ সে বোঝাতে চাচ্ছে খারাপ জিনিস বলা ঠিক না। স্যার উনি বলছেন এখন আপনাদের টয়লেটে স্থান নিয়েছেন। একটু স্যার সাবধানে থাকবেন। ভয় টয় পেতে পারেন...তাই বললাম।

জমিরুদ্দীন সাহেব এবার পেপার নামিয়ে সরাসরি তাকালেন ড্রাইভার ফজলের দিকে। চেহারা দেখে মনে হয় না ইয়ার্কী করছে। আর তার সাথে ইয়ার্কী করারকথাও না।

উনারা তোমার সাথে কথাবার্তা বলতেন মনে হচ্ছে ?

জি স্যার শেষের দিকে বলতেন।

কি বলতেন?

ফজল আলী আবার জীভে কামড় দেয়। অর্থাৎ বলা যাবে না।

ঠিক আছে যাও। জমিরুদ্দীন সাহেব বুঝলেন একে মনে হচ্ছে আর রাখা যাবে না। মাথা খারাপ হয়ে গেছে এর, উল্টা পাল্টা বকছে ইদানিং। তিনি দেখেছেন সব ড্রাইভারই প্রথম কয়েক বছর ভাল থাকে। তারপর সমস্যা শুরু হয়। যেমন এর হয়েছে।

কিন্তু সেই রাতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। রাত দুটোর দিকে বাথরুমে যাওয়ার জন্য তিনি বিছানা থেকে নামলেন। বেশ ক'দিন ধরে একা একা আছেন। স্ত্রী কানাডায় মন্ট্রিলে ছেলের কাছে গেছেন। আগামী মাসে আসার কথা। একা একা আর ভাল লাগছে না। টয়লেটের দরজায় হাত দিয়ে অবাক হলেন। অসম্ভব ঠাণ্ডা দরজাটা। যেন ফ্রিজের ভিতরে হাত দিয়েছেন।বাথরুমের লাইটের সুইচটা ভিতরে দরজা খুলে বাম দিকে হাত দিলেই সুইচ। দরজা ঠেলা দিতেই ...মনে হল কে যেন ভিতর থেকে ঠেলে রেখেছে দরজাটা। খুলতে দিচ্ছে না। ড্রাইভার ফজলের কথামনে পড়ল তার।

তার পরও জোরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকলেন। লাইটও জ্বালালেন। বাথরুমে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ঠাণ্ডা, বেশ ঠাণ্ডা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট কাজটা সারলেন। যদিও তিনি দাঁড়িয়ে এ কাজ করার পক্ষপাতি না। তার পায়ে সমস্যার কারণে হাই কমোডে বসতে অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া দাঁড়িয়ে করলে শরীরের এলবুমিন সরাসরি বের হয়ে যায় শরীর থেকে, এটা খারাপ। তিনি ফ্লাশ করলেন, হর হর করে পানি বের হল। তখন তার মনে

boighar.com

হল ঢাকা শহরে এত পানির ক্রাইসিস, হাই কমোড উঠিয়ে দেওয়া উচিত। হাই কমোডের একবারের ফ্লাশে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়। ...তখনই তিনি টের পেলেন ঠিক তার পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু শূন্য বাথরুম, আর তখনই তিনি দেখলেন তার পায়ের কাছে এক জোড়া পায়ের ছাপ ...পানিতে ভেজা এক জোড়া পায়ের ছাপ ... কেউ একজন একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল... এখন নেই...তিনি ছাপটা খেয়াল করলেন... সাধারণ মানুষের মত পা কিন্তু সবগলো আঙ্গুল সমান। তার ঘাড়ের কাছে একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। তিনি কি ভয় পাচ্ছেন? তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন বাথরুম থেকে বের হওয়ার জন্য, তখনই তিনি ভয় পেলেন, সত্যিকারের ভয় পেলেন।বাথরুমের আয়নায় একটা মানুষের মুখ। হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আয়নার সামনে কেউ নেই। নিচে এক জোড়া পায়ের ছাপ যার পায়ের আঙ্গুলগুলো সব সমান।

জমিরুদ্দীন হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেললেন। নিজেও বুঝতে পারলেন না যে তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন। তিনি বাথরুমে সশব্দে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারালেন। মাথাটা ঠুকে গেছে হাই কমোডের ওয়াটার কন্টেইনারে!

জ্ঞান ফিরতে নিজেকে আবিষ্কার করলেন একটা ক্লিনিকের কেবিনে। তার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে তার ড্রাইভার ফজল আলী।

– স্যার এখন কি ভাল আছেন?

জমিরুদ্দীন কথা বললেন না।

স্যার, এখন কি ভাল আছেন?

আছি।

স্যার, খালাম্মাকে জানানো হইছে। তিনি চইলা আসতেছেন।

তাকে কেন জানাতে গেলে?

না জানায়া উপায় কি স্যার? এত বড় ঘটনা!

জমিরুদ্দীন চুপ করে থাকেন।

কিন্তু স্যার, একটা সমস্যা হইছে।

কি ?

স্যার, উনারা তো এই কেবিনের টয়লেটে চলে আসছেন।

ফজলের চোখে স্পষ্ট ভয়। সেই ভয় জমিরুদ্দীন সাহেবকেও স্পর্শকরল

... ‘ তারা আসলে কি চায়?’

তারা স্যার... ফজল এদিক ওদিক তাকায়। তারপর ফিস ফিস করে বলে ‘ তারা সার আপনেরে পছন্দ করছে। আপনেরে চায়...আপনেরে তাদের দলে নিতে চায়।

তারা তোমাকে নেয় নাই কেন?

আমার টয়লেটে স্যার আয়না ছিল না। আয়না ছাড়া উনারা আসতে পারেন না।

উনারা কারা?

স্যার... উনারাই আপনাকে জানাবেন উনারা কারা।

এ সময় নার্স ঢুকে।

আপনি উনার সাথে এত কথা বলছেন কেন? জানেন না উনার সাথে বেশি কথা বলা নিষেধ...যান যান ভিজিটিং আওয়ার শেষ।

আমি উনার ড্রাইভার।

যেই হোন কথা কম বলেন।

নার্স অভ্যস্ত হাতে একটা ইনজেকশন পুশ করে চলে গেল।

জমিরুদ্দীনসাহেব বাসায় আসলেন তিন দিন পর। ততদিনে স্ত্রীও চলে এসেছেন মন্ট্রিল থেকে।

কিভাবে কি হল বলো তো?

কেন? ফজল বলে নি?

ফজলের মুখ থেকে শুনতে হবে কেন? তোমার বলতে অসুবিধা আছে?

না তা নেই...

আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার...বাথরুমের আয়নাটা কই?

ও...ইতস্তত করেন জমিরুদ্দীন সাহেব ‘ ওটা ফজল খুলে ফেলেছে।’

ফজল খুলে ফেলেছে মানে?

আমিই ওকে খুলতে বলেছি।

কেন?

অসুবিধা আছে একটু। তোমাকে পরে বলছি।

কেন এখন বলতে সমস্যা কি?

না সমস্যা আর কি... মানে হয়েছি কি...

boighar.com

পুরো বিষয়টা খুলে বলতে হয় জমিরুদ্দীনকে। অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে পুরো ঘটনাটা শুনলেন তিনি। তারপর দুটো কাজ করলেন। ড্রাইভার ফজলকে বিদায় দিলেন। আর বাথরুমে নতুন আয়না লাগালেন।

তুমি আমার বাথরুমে যাওয়া বন্ধ করতে চাও মনে হচ্ছে?

ভয়ের কিছু নেই, তুমি বাথরুমে গেলে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। তোমার আয়না ভূতরা তোমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

আয়না ভূত?

হ্যাঁ কেন? নামটা খারাপ হল নাকি?

সত্যি সত্যিই সেদিনবাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন মিসেস জমিরুদ্দীন। আর জমিরুদ্দীন দরজা খোলা রেখেই ঢুকলেন টয়লেটে। নতুন আয়নার দিকে তাকাবেন না তাকাবেন না করেও তাকালেন ... এবং তিনি জমে গেলেন ঘাড়ের কাছে শির শির করছে তার ... চিৎকার করে স্ত্রীকে ডাকলেন? গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। আয়নার মধ্যে ফজলকে দেখা যাচ্ছে...সে হাত তুলে তাকে ডাকছে...ঐদিনও কি তাহলে তিনি ফজলকেই দেখেছিলেন? তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যান আয়নার দিকে ... চকচকে আয়নার মসৃণ তলটা শান্ত জলের মত কেঁপে উঠল ... ভেঙে গেল ফজলের মুখটা সেখানে তার নিজের মুখটা দেখা যাচ্ছে ... তিনি যেন আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগলেন... তলিয়ে যেতে লাগলেন... কেউ একজন ফিস ফিস করে বলল...'স্যার চইলা আসেন ...এই খানে অনেক শান্তি' ফজলের গলা না? তীব্র শীতের অনুভূতি নিয়ে অন্য এক জগতে তলিয়ে যেতে লাগলেন জমিরুদ্দীন সাহেব...। বাইরে অপেক্ষা করা তার স্ত্রী মলি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

কি হল তোমার? ঘুমালে নাকি?

ভিতর থেকে কোনো উত্তর নেই।

কি হল? কথা বলছ না কেন?

মলি দরজা খুলে আস্তে করে ঢুকলেন বাথরুমে। একি! ও কই? কেউ নেই টয়লেটে!! হঠাৎ চোখ গেল আয়নায়...জমিরুদ্দীন সাহেবকে আয়নায় দেখা যাচ্ছে। হাসি মুখে তাকে হাত তুলে ডাকছেন তিনি...!

বীথির ভয়

বীথি আগামী বছর নাইনে উঠবে। অবশ্য তাকে দেখলেসেটা বোঝার উপায় নেই। দেখলে মনে হয় হয়তো সিক্স কি বড়জোর সেভেনে পড়ে।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে বীথি দেখে ড্রইংরুমের পাশের ছোট্ট রুমটা, যেটা এতদিন স্টোররুম ছিল, সেটা খালি করে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করছেন মা।

'কী ব্যাপার, মা?'

'এই ঘরটা ঠিকঠাক করছি।'

'কেন?'

'কেন, তোর বাবা কিছু বলে নি তোকে?'

'কী বলবেন?'

'আজ থেকে এটা তোর ঘর।'

'কেন?'

'বাহ্ বড় হয়েছিস, এখনো বাবা-মার সঙ্গে ঘুমাবি? এই দেখ, কী সুন্দর বিছানা করা হয়েছে তোর জন্য।'

বীথির মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার আসলে একা একা ঘুমাতে ভয় লাগে। তার ভীষণ ভূতের ভয়। তারপরও সে মেনে নিল। নিজের একটা ঘর হবে এটাও মন্দ না। ঘরটা কিন্তু ভালোই হলো। বাবা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। বাবা অবশ্য বললেন, 'একা একা ঘুমাতে কখনো ভয় লাগলে চলে আসবি। পাশের ঘরেই তো আমরা আছি।'

আসলে বাবা ভুল বললেন। ঘরটা পাশেই, তবে যেতে হয় একটা লম্বা করিডোর পার হয়ে। তারপরও নিজের ঘরটাকে ভালোবেসে ফেলল বীথি।

boighar.com

অন্তর কথা

প্রথম যেদিন ঘুমাতে গেল, সেদিন সে টেরই পেল না। শোয়ামাত্র ঘুম। আসলে ঐদিন স্কুলে ওদের ক্লাস পার্টি ছিল বলে খুব পরিশ্রম হয়েছিল ওর, তাই শোয়ামাত্র ঘুম....।

দ্বিতীয় দিন কিছুতেই আর ঘুম আসে না। তার ঘরে ছোট্ট একটা জানালা। একটুউপরের দিকে জানালাটা। জানালার ওপাশেই একটা গাছ। তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছের একটা ডাল মাঝে-মধ্যে তার জানালার পাল্লায় বাড়ি খায়। তখন বুকটা ধক করে ওঠে বীথির। ইচ্ছে হয় ছুটে চলে যায় বাবা-মার ঘরে।

তৃতীয় দিনটাও ভালোই কাটল।

চতুর্থ দিনেও কোনো সমস্যা হলো না।

পঞ্চম দিনে একটা ছোট্টসমস্যা হলো। রাত তখন দেড়টার মতো। বাথি লাইট জ্বালিয়ে একটা বই পড়ছিল 'অমল ধবল পাল'। ঠিক তখন কী একটা শব্দ হলো। জানালা বন্ধ করা। কেউ যেন জানালায় টোকা দিল– একবার...দুবার...তিনবার...তারপর মিহি গলায় কে যেন ডাকল বাথিকে...'বীথি... বীথি... বীথি...'। বীথির প্রথমে মনে হলো– মা ডাকছেন। না, মা না, ডাকটা আসছে জানালার ওপাশ থেকে। বীথির বুকটা ধক করে উঠল। তারপর সাহস করে বীথি ফিসফিস করে বলল, 'কে?'

'আমি, আমি, আমি।' তিনবার 'আমি, শব্দটা শুনল বীথি। এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে– শব্দটা হলো বীথির ঘরের ভিতর। বীথি বই বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। ঘরে লাইট জ্বলছে। তারপরও প্রচণ্ড ভয়ে বাথি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'বাবা!' চিৎকার করে বাবাকে ডাকল বীথি। অবশ্য ডেকে লাভ নেই। বাবা-মা শুনতে পাবেন না। একটা কাজ করা যেতে পারে– দেওয়ালে শব্দ করলে ওপাশের ঘরে বাবা-মা শুনতে পারবেন। তাই করবে, নাকি একছুটে বাবা-মার ঘরে চলে যাবে? সেটাই ভালো।

বীথি তার খাট থেকে নামতে যাবে। কিন্তু খাটটা অনেকটাই উঁচু। সে মেঝেতে পা দিতে যাবে... ঠিক তখনই বীথি একদম জমে গেল। ঠিক তার খাটের তলা থেকে একটা মাথা বের হয়ে আসছে। একটা বাচ্চার মাথা, যেন সে খাটের নিচে লুকিয়ে ছিল, এখন বের হয়ে আসছে। প্রচণ্ড

boighar.com

ভয়ে আবার লাফিয়ে খাটের উপর বসল বীথি। সে টের পেল তার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধক ধক করছে।বাচ্চাটার কপাল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাটা থেমে গেল। আর বের হচ্ছে না। যেন খাটের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে তার সঙ্গে মজা করছে!

আর কী আশ্চর্য, তখনই বীথি দেখে তার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। বাবা দাঁড়িয়ে দরজায়।

'ভয় পেয়েছিস, মা?'

'হ্যাঁ বাবা, ভীষণ ভয় পেয়েছি।'

'আয়, আমার কোলে আয়।'

বীথি এক রকম ঝাঁপিয়ে বাবার কোলে উঠে পড়ল। বাবা দু হাতে তাকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বীথি চোখ বন্ধ করে রইল যেন খাটের নিচের ছোট বাচ্চার মাথাটা তাকে আবার দেখতে না হয়।

'ও কী, ধাড়ি মেয়েকে কোলে করে ঘুরছ কেন?' মা ঘুম ঘুম চোখে বলেন।

'ও ভয় পেয়েছে।' বাবা বীথিকে পাশে শুইয়ে দেন। নিজেও শুয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে বীথি।

পরদিন নাস্তার টেবিলে চা খেতে খেতে বাবা বলেন, 'কী রে বীথি, কাল রাত্রে কখন আমাদের ঘরে এলি?'

'মানে?' বীথি অবাক হয়।

'মানে ভয় পেয়ে এসেছিলি?'

'তুমিই তো আমাকে নিয়ে এলে।'

'আমি?' বাবা ভ্রূ কোঁচকালেন।

'বাহ্ তোমার মনে নেই?' বীথি গতরাতের সমস্ত ঘটনা বাবাকে খুলে বলে।

বাবা-মা অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকান। কোনো কথা বলেন না।

'মা, আমি আর ও-ঘরে শোবো না।'

'ঠিক আছে মা, শুতে হবে না।' বাবা বলেন। মাও মাথা নেড়ে সায় দেন। বীথি মনে মনে হাফ ছেড়ে বাঁচে। মনে মনে সেই বাচ্চাটাকে ধন্যবাদ দেয়– ওর কারণে আরো কিছুদিন বাবা-মার সঙ্গে ঘুমানো যাবে, তাই বা মন্দ কী! কিন্তু ছেলেটা কে?

জৈতুন

আমার খুব শখ একটা ভূত দেখার।

তাহলে আমাদের গ্রামে চল।

তোদের গ্রামে ভূত আছে?

না।

তাহলে?

আমাদের গ্রামের আবহাওয়াটা ভুতুরে।

যেমন?

যেমন ধর তুই যদি তেঁতুল বাগানে ঢুকিস।

তেঁতুল বাগান মানে?

আমাদের গ্রামে একটা তেঁতুল বাগান আছে। প্রায় দুই বিঘা এলাকা জুড়ে শুধু তেঁতুল গাছ আর তেঁতুল গাছ। অবশ্য গ্রামবাসীরা এটাকে তেঁতুল বাগান বলে না, বলে তেঁতুল বন। জানিসতো তেঁতুল গাছে ভূত থাকে ?

ভূত, না পেত্নী

ঐ হল। যাবি?

কোথায়?

আমাদের গ্রামে? আমি পরশু যাচ্ছি।

সত্যি? চল তাহলে যাই। তেঁতুল বাগানে যাব কিন্তু।

হ্যাঁ যেতে পারবি, তবে দিনে। রাতে কেউ যায় না ওখানে।

আমি রাতেই যাব।

আগে গ্রামে চল তো...

বেশ চল।

boighar.com

বইঘর.কম

রঞ্জনদের গ্রামে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল মঞ্জু... এত সুন্দর একটা গ্রাম? ছিমছাম সাজানো গোছানো। যেন কোন শিল্পী নিজের হাতেখুব যত্ন নিয়ে বসে বসে এঁকেছে এই গ্রামটাকে। যেখানে যেটা দরকার। আঁকাবাঁকা মাটির রাস্তা। রাস্তার পাশে বড় বড় সব ঝাঁকড়া গাছ।

এ গুলো কি গাছ রে?

শ্যাওরা গাছ।

বলিস কি? শ্যাওরা গাছে তো ভূত থাকে রে...

বলেছিলাম না আমাদের গ্রামটা ভুতুরে... তবে ভূত নেই! কেউ দেখেনি।

আমি দেখে ছাড়ব...

চল আগে বাড়ি পৌঁছাই... খাই দাই ... তারপর বিকেলে তোকে নিয়ে বের হব।

রঞ্জনদের বাড়িটা দেখে তাজ্জব বনে গেল মঞ্জু। মাটি আর ছন দিয়ে এত সুন্দর বাড়ি হতে পারে?

তুইশালা এ আমাকে কোথায় আনলি রে?

মানে?

এ তো হেভেন রে ...।

শুনে রঞ্জন হাসে। 'তুই আসলে শহরের ছেলে। কখনো গ্রামে আসিস নি। তাই যা দেখছিস তা-ই ভাল লাগছে। চলব্যাগ ট্যাগ রেখে পুকুর থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসি ...'

পুকুর পাড়ে গিয়েও মঞ্জু মুগ্ধ। ছোট্ট গোল একটা পুকুর, মাঝখানে শাপলা পাতা ভাসছে থালার মতো, তার আশেপাশে ফুটে আছে গোটাচারেক ধবধবে সাদা শাপলা ফুল। নতুন বছরের ক্যালেন্ডারে এ রকমের ছবি দেখা যায়... অথচ এখন তার চোখের সামনে যেন সেই ক্যালেন্ডার ...

' আমি শালা এই গ্রামেই থেকে যাব...,

রঞ্জন হাসে '– থেকে যা। তোর জন্য একটা বউ দেখি! কি বলিস? বিয়ে থা করে এখানেই সংসারী হ !'

বিয়ে? বলিস কি? তা হলে তো সোনায় সোহাগা রে! মা-বাবা অবশ্য যথেষ্টই চাপ দিচ্ছে। তা মন্দ কি? এই গ্রামেই না হয় ...

থমকে গেল মঞ্জু। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অসাধারণ রূপসী এক তরুণী হাতে একটা গামছা নিয়ে। মাথায় লম্বা ঘোমটা দেয়া।

boighar.com

একি জৈতুন, তুমি গামছা নিয়ে এসেছো কেন? ওরা কই?

বাড়িতে কেউ নেই।

ও আচ্ছা। পরিচয় করিয়ে দেই– মঞ্জু এ আমার চাচাতো বোন জৈতুন, এখানেই থাকে। আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু মঞ্জু। আমার সাথেই ডাক্তারী পাস করেছে, কিন্তু ডাক্তারী করে না, বড় ব্যাবসায়ী...নিজেও বিরাট ধনী।

ধুর! কি সব বলিস? বাধা দেয়ার চেষ্টা করে মঞ্জু।

আদাব। মেয়েটি মাথা ঝোকায়। মঞ্জু কিছু বলতে গিয়েও থমকে যায় যেন। ' খাবার দেয়া হয়েছে আপনাদের ' বলে মেয়েটি গামছাটি বাড়িয়ে ধরে বোধহয় মঞ্জুর দিকেই। মঞ্জুর তাই মনে হয়।গামছাটি নিতে গিয়ে জৈতুনেরহাত ছুঁয়ে যায় মঞ্জুর...যেন ইলেকট্রিক শক লাগে।...চোখাচোখি হয় জৈতুনের সাথে। জৈতুন চোখ সরিয়ে নিলেও তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মঞ্জু।

রঞ্জনদের বাড়িতে রঞ্জনের চাচা আর চাচি থাকে। তাদের দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে জৈতুন, বিধবা। অল্প বয়সে স্বামী হারানোর পর আর বিয়ে করেনি। ছেলে দুজনের মধ্যে একজন ঘর গেরস্থালীর কাজ করে, আরেকজন পড়াশুনা করে স্কুলে। পাশের গ্রামেই একটা হাই স্কুল আছে। অবশ্য ওদের দুজনের কেউই আজ বাড়ি নেই, গঞ্জে গেছে। চাচা অসুস্থ প্রায় প্যারালাইজডের মতন, শুয়ে বসেই থাকেন। চাচি উঠে এসে খোঁজ খবর নিলেন রঞ্জনদের।

খেতে বসে ঠিক শান্তিতে খেতে পারল নামঞ্জু কারণ সামনে বসে ভাত তরকারি এগিয়ে দিচ্ছিল জৈতুন। আর বার বারই চোখাচোখি হচ্ছিল তার সাথে।

কিরে মঞ্জু খাচ্ছিস না ঠিকমত?

খাচ্ছি খাচ্ছি ... আসলে কি জানিস সামনে এ রকম রূপসী কেউ বসে থাকলে কি ঠিকমত খাওয়া যায় বল ?

জৈতুন চোখ তুলেতীব্র চোখে তাকায় মঞ্জুর দিকে। তারপর উঠে চলে যায়। রঞ্জন বিরক্ত চোখে তাকায় মঞ্জুর দিকে– 'তোর কথাবার্তার কোনো লাইন ঘাট নাই ... '

ভুল কি বলেছি?

ভুল বলিস নি। কিন্তু বেচারা গ্রামের একটা সাধারণ মেয়ে ... সব ফান নিতে পারে না ও।

ঠিক আছে। যা ভুল হয়েছে। ওকে ডাক।

খা তো... আর ডাকাডাকির দরকার নেই ... 'ঐ সৌন্দর্যই ওকে খেল... ' শেষ কথাগুলো বিড় বিড় করে বলে রঞ্জন।

বিকেলের দিকে দু বন্ধু রওনা দিল তেঁতুল বনের দিকে। গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হল অনেকটাই। এই গ্রামে রিক্সা চলে না।

দোস, একটা কথা বলব?

বল।

জৈতুনের বর মারা গেল কিভাবে?

পানিতে ডুবে।

মানে?

মানে আর কি? পিছনের পুকুরটায় গোসল করতে নামল। তারপর...

তারপর?

তারপর মরে ভেসে উঠল ...

সাঁতার জানতো না?

জানতো।

তাহলে?

বাদ দে তো ... এই প্রসঙ্গটা।

আচ্ছা তোকে আরেকটা কথা বলতে চাই... যদি কিছু মনে না করিস।

আমি জানি তুই কি বলবি।

কি?

তুই এখন বলবি, জৈতুনকেকেন আবার বিয়ে দেয়া হচ্ছে না? ...এই তো? মাথা নাড়ে মঞ্জু। ' এবং তোর মনে আরেকটা প্রশ্ন জৈতুনকে দেখার পর থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে ... সেটা হচ্ছে তুই ওকে বিয়ে করতে চাইলে আমরা রাজি হব কিনা ...রাইট?'

হ্যাঁ।

শোন, তোকে স্পষ্ট করে বলি– আমরা রাজি না।

কেন?

কারণ ওকে যে বিয়ে করবে সেই মরবে... এটা পরীক্ষিত সত্য।

কি বলছিস?

হ্যাঁ ঠিকই বলছি... ওর আসলে দুবার বিয়ে হয়েছে। দুজনই...পানিতে ডুবে মরেছে।

boighar.com

ঐপুকুরে? একই ভাবে ?

হ্যাঁ...

কিন্তু ...

প্লিজ মঞ্জু এ নিয়ে আর কোন কথা নয় ...ঐ যে আমরা তেঁতুল বনে পৌঁছে গেছি...ঢুকবি, না বাইরে থেকেই দেখবি?

অবশ্যই ঢুকবো।

বেশ চল। কিন্ত বেশিক্ষণ ঘোরা যাবে না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বের হব আমরা।

তেঁতুল বাগানটা অসাধারণ। উপরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল মঞ্জু। তেঁতুল গাছের ছোট ছোট সবুজ পাতাগুলো বিকেলের নরম আলোয় জ্বল জ্বল করছে। সবুজ রংটা যে এতটা মায়াকাড়া আগে বুঝেনি মঞ্জু। সে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। কতক্ষণ হেঁটেছে মঞ্জু বলতে পারবে না। তবে এক সময় সে পিছে তাকিয়ে দেখে রঞ্জন নেই। সে চেঁচাল– ' রঞ্জন?' ' রঞ্জন?' ' রঞ্জন!'

কোন উত্তর এল না। মঞ্জু অবশ্য মোটেই ঘাবড়াল না। সে সিগারেট বের করে ধরাল। অসাধারণ জায়গা। এখানে গোটা কয়েক সিগারেট না খেলেই নয়। মঞ্জু টের পাচ্ছে চারদিক ঘন কালো হয়ে আঁধার নেমে আসছে। উপরের তেঁতুল বনের সবুজ বিচ্ছুরণ নিভে আসছেক্রমে ক্রমে...!

কি হল আপনি একা আসলেন যে ? বন্ধু কই?

তেঁতুল বনে রেখে আসছি।

কেন?

তোমারে বিয়া করতে চায়।

উফ ... সত্যি? খিল খিল করে হাসে জৈতুন। 'বলেন নাই আমার দুই স্বামীরে আমি মারছি?'

বলছি ...

আমি মারছি বলছেন?

না, ঐভাবে বলি নাই।

তাইলে কিভাবে বলছেন?

বলছি ওরা পানিতে ডুবে মরছে।

জৈতুন খিল খিল করে হাসে– ' তবে আপনার বন্ধুটারে আমার কিন্তু সত্যি পছন্দ হইছে... ও কি আমাকে সত্যি বিয়ে করবে বলছে ? '

বাদ দাও তো।

বাদ দিব কেন? এই গ্রামে আর আমার ভাল লাগে না। শহরে যাব, টিভি দেখব, সিনেমা দেখব, শাড়ি গয়না কিনব। আপনি তো আর আমারে শহরে নিলেন না।

বললেই তো আর হয় না!

কেন হয় না? আপনি ভয় পান? আপনের বন্ধুরে মেরে ফেলব আমি ?

তুমি তো মারো না। যে মারে...

কে মারে?

জৈতুন কেন রহস্য করো? যাও ওকে পথ দেখায়া নিয়া আসো।

ওকে আনতে গেলে ও তো ভয় পাবে। পরে আর বিয়ে করতে চাইবে না। তখন? হাসতে হাসতে বলে জৈতুন।

ওর ভূত দেখার শখ ...।

আমি ভূত? কি বলেন আপনি এইসব? হি হি করে হাসে জৈতুন।

প্রায় অন্ধকারে বসে আছে মঞ্জু। ফেরা দরকার। কিন্তু ঠিক কোন রাস্তা ধরে এগুবে ঠিক বুঝতে পারছে না। ঠিক এই সময় তার নাকে একটা গন্ধ এল– মিষ্টি একটা গন্ধ। পরিচিত গন্ধ ...। তখনই মনে হল জৈতুন যখন তাকে পুকুর পারে গামছা এগিয়ে দিয়েছিল তখন গন্ধটা পেয়েছিল সে। জৈতুনের গা থেকে আসা একটা গন্ধ নাকি? ... হঠাৎ মঞ্জুর মনে হল কারো পায়ের শব্দ যেন, মরা পাতার উপর দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে! কে? ...ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মঞ্জু। বুকের সব রক্ত ছলাৎ করে উঠল ... জৈতুন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার সামনে ... মুখটা হাসি হাসি... ঘোমটা নেই মাথায়... শাড়ির আঁচলটা উথাল পাথাল উড়ছে... এড্রেনালিন হরমন নামছে শরীরে... থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে টের পায়মঞ্জু...

চলেন আপনাকে নিতে আসছি।

আ-আপনি?

হ্যাঁ আমি জৈতুন ...সবাই বলে ডাইনি জৈতুন ... দুই দুইটা স্বামীরে খাইছি তো তাই ...' খিল খিল করে হাসে জৈতুন। ' ধরেন আমার হাত ধরেন' বলে সত্যি সত্যি একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। মঞ্জুর মনে হয় অনেক দূর থেকে জৈতুনের হাতটাছুটে আসছে ... আসছে... মঞ্জু কম্পিত হাতে তার হাতটাএগিয়ে দেয়। খপ করে ধরে ফেলে জৈতুন। অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগে শরীরে। মাথাটা ঘুরে উঠে... চারিদিকে একটা হা হা শব্দে দমকা বাতাস যেন মঞ্জুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চায়। মঞ্জু শক্ত করে চেপে ধরে রাখে জৈতার নরম হাত...।

boighar.com

তুই আমাকে তেঁতুল বনে ফেলে চলে এলি?

তুই না বললি ভূত দেখবি?

তারপরও ...মঞ্জু কি বলতে গিয়েও বলে না।

তারপর কি বল? ভূত দেখতে পেয়েছিলি?

না। কিছু না।

চল ...ঢাকা ফিরে যাই।

না।

না মানে?

মানে... আমি যাচ্ছি না।

কি করবি তুই এখানে?

যাব... তবে জৈতুনকেবিয়ে করে নিয়ে যাব। কথাটা জোর দিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করে মঞ্জু।

ভেবে বলছিস?

ভেবে বলছি।

জৈতুনকে এখানে সবাই ডাইনি জৈতুন বলে। জানিস?

জানি।

তারপরও করবি বিয়ে?

করব।

জৈতুনকে বলেছিস?

বলেছি।

সে রাজি?

হুঁম্, তুই বিয়ের ব্যবস্থা কর। একটা কাজী ডাক। কাজী আছে এই গ্রামে?

আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে রঞ্জন।

জৈতুনকে নিয়ে বিকেল চারটায় ঢাকায় পৌঁছে মঞ্জু। গুলশানের বিশাল বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচটা। বাসার গেটে প্রচুর মানুষ। ব্যাপার কি? মঞ্জুকে দেখে ছুটে আসে দারোয়ান।

ভাইয়া, সর্বনাশ হইছে।

কি সর্বনাশ ?

একটু আগে আপনের আম্মা-আব্বা দুইজন একসাথে সুইমিংপুলে...

মঞ্জু অবাক হয়ে জৈতুনের দিকে তাকায়। তার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছেজৈতুন। ফিস ফিস করে বলে– ‘ তুমি ভয় পেয় না...তোমার কিছু হবে না...আমরা দুজন শুধু এই বাসায় থাকব, ঠিক আছে?’ মঞ্জু অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জৈতুনের দিকে!

আদনান সাফির মা

আমি মরলে বাহাত্তর ঘণ্টা পর কবর দিবি।

কেনদাদি?

দিবি কিনা বল... আগে কথা দে।

আচ্ছা কথা দিলাম। বাহাত্তর ঘণ্টা পর কবর দিলেতো দাদি তোমার শরীর থেকে পঁচা গন্ধ ছুটবে।

আহ্ ঝন্টু! বাজে কথা বলবি না। ছোট ভাইকে বড় ভাই মন্টু ধমক লাগায়।

আচ্ছা দাদি, কারণটা বলবে না?

আছে কারণ আছে ...

কি কারণ সেইটা খুলে বলো না!

তোরা বুঝবি না।

বুঝবো বুঝবো... বুঝায়া বললেই বুঝবো।

তাইলে বলি শোন... আমার একটা সমস্যা আছে ... মৃত্যুভয় আমার নাই। বয়স হইছে মরব, সেইটাই স্বাভাবিক।

দাদি তোমার বয়স কত হইল?

তিরাশি পার করছি।

আহ্ ঝন্টু! কথার মাঝে কথা বলিস... দাদি তুমি বলো...মৃত্যুভয় তোমার নাই... তারপর?

হ্যাঁ... যা বলছিলাম, মৃত্যুভয় আমার নাই ... তবে একটা ভয় আমার আছে...

সেটা কি?

সেটা হচ্ছে। ধর আমি মরলাম, তোরা কবর দিলি। মাটির নিচে চলে গেলাম। অন্ধকার কবর। হঠাৎ বাইচা উঠলাম, তখন কি হবে? তাই

boighar.com

বইঘর.কম

বলছিলাম বাহাত্তর ঘণ্টা পর যখন নিশ্চিত হবি আমি সত্যিই মরছি... তখন...

ছোট নাতি ঝন্টু হি হি করে হেসে উঠে। ' মরলে কেউ আবার বেঁচে উঠে নাকি?'

আহ্ ঝন্টু! কথার মাঝে ডিসটার্ব করবি না তো... দাদি তোমার সমস্যাটা ধরতে পেরেছি। ইন্টারেস্টিং সমস্যা। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয় দাদি?

কি কাজ?

ধরো আমরা বাড়ির পিছনে একটা মিথ্যা কবর খুড়লাম তোমার জন্য , সেখানে মাঝে মাঝে তুমি শুয়ে থাকলে... আমরা উপর দিয়ে কবরটা ঢেকে দিলাম...

মানে?

মানে... আগে থেকেই কবরে থাকার একটা প্র্যাকটিস... তাহলে কবরের অন্ধকারের ভয়টা কেটে যাবে তোমার। কবরের ভিতরে যদি বেঁচেও যাও তখন আর সমস্যা হবে না।

দাদি মোসাম্মাত ফাতেমা বেগম বুঝতে পারলেন তার নাতি দুইটা আসলে তার সাথে ফাজলামো করছে। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুড়ো বয়সে এখন ঘরের এক কোনায় পড়ে থাকেন। কেউ খুব একটা খোঁজ খবর নেয় না। এই নাতি দুইটা মাঝে মধ্যে আসে। তাদের সাথে খোলামেলা কথা বলেন। কিন্তু আজ বুঝলেন এরা আসলে ফাজলামো করতে আসে। তিনি ধরতে পারেন না।

কি দাদি আইডিয়াটা কেমন?

ভাল।

কবর কি তাহলে খুড়বো ?

মোসাম্মাত ফাতেমা বেগম তার চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। বড় নাতিটার ঠোঁটেসূক্ষ্ম একটা হাসি। আর ছোটটা দাঁত বের করে আছে আগে থেকেই।

তোমরা এখন যাও ... পরে কথা হবে। কাঁপা হাতে তিনি বালিশটা নাড়েন। বালিশের নিচ থেকে তজবিটা খুঁজে হাতে নিয়ে অভ্যস্ত হাতে টিপতে থাকেন... ।

boighar.com

সেইদিনই মোসাম্মাত ফাতেমা বেগম মারা গেলেন ভোর চারটায়। সবাই টের পেল ভোর আটটায়। ফাতেমা বেগমের ছেলেআদনান সাফি ঠিক বুঝলেন না তার কাঁদাটা উচিত হবে কিনা। তবে এটা ঠিক তার কান্না আসছিল না। এবং তিনিআশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলেন কেউ কাঁদছে না তার মার জন্য। বড় দুই বোন আর এক ভাই বিদেশে থাকে, তাদের জানানো হল ফোন করে। বড় ভাই আর এক বোন কোনো রি অ্যাকশন দেখাল না ,আরেক বোন অবশ্যফোঁপানের মত একটা শব্দ করল বলে মনে হল... অবশ্য আদনান সাফির শুনতে ভুলও হতে পারে।

তবে বাসার সবাই খুব দ্রুতইব্যস্ত হয়ে গেল তাকে কবর দেওয়ার জন্য। এক ফাঁকে স্ত্রীকে ডেকে আদনান সাফি বললেন, ছেলেদের স্কুল থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। মা মারা গেলেন...

ওদের পরীক্ষা চলছে না... ফাইনাল পরীক্ষা !

ওহ্!

আদনান সাফি আর কথা খুঁজে পান না। তিনিও অন্যদের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কবর দেয়ার যোগাড় যন্ত্র করতে।

মন্টু আর ঝন্টু যখন ফিরে এল বাসায়, তখন তাদের দাদির লাশ নিয়ে বের হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বড় ছেলে মন্টু অবাক হল তবে ততটা রিঅ্যাক্ট করল না, কিন্তু ছোটটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল 'দাদি দাদি'বলে। আদনান সাফির বুকের ভিতর একটা কষ্ট এবার ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইল। তিনি ফিস ফিস করে বললেন 'মারে আমার মা... তোরে কত অবহেলা করছি...' টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে। তিনি পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজলেন। রুমাল নেই।

এই সময় বড় ছেলে মন্টু এল।

বাবা, একটু কথা ছিল।

কি কথা?

একটু এদিকে আসো।

আড়ালে নিয়ে গিয়ে মন্টু যা বলল তাতে অবাক হলেন আদনান সাফি।

দাদিকে বাহাত্তর ঘণ্টা পর কবর দিলে হয় না?

মানে?

না মানে, কাল দাদি সেরকমই বলছিলেন... তার নাকি একটা ভয় হয়...কবরের ভিতর যদি তিনি বেঁচে উঠেন। সেজন্য বাহাত্তর ঘণ্টা পর ...

তোমার দাদি মারা গেছেন। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন।

ও। বড় ছেলে চুপ করে যায়।

মোসাম্মাত ফাতেমা বেগম মারা গেলেন ভোর চারটায়। আর দুপুর তিনটার ভিতর তাকে কবর দিয়ে ফিরে এলেন সবাই। একটা জলজ্যান্ত মানুষ নাই হয়ে গেল। আদনান সাফি ফিরে এসে দেখেন মায়ের ঘরটা ঝাড়পোছ করা হচ্ছে। আগেই কথা ছিল এই ঘরটা খালি হলে ছোট ছেলে ঝন্টুকে দেয়া হবে। কারণ ঝন্টু বড় হয়েছে, তার একটা আলাদা রুম দরকার। এতদিন দুই ভাই এক সাথে ছিল। এখন... মন্টুর রুমে মন্টু একা থাকবে আর মার রুমে ঝন্টু।

আদনান সাফি বারান্দায় এসে বসলেন।

চা খাবে? স্ত্রী শোভা নরম গলায় বলে।

না।

শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও।

কথা বলেন না আদনান সাফি। তার স্ত্রী কি তার মার প্রতি আরেকটু সদয় হতে পারত না? তিনি বুঝতেন তার স্ত্রী বৃদ্ধা শাশুড়িকে অতটা পছন্দ করতেন না। অবশ্য তাকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে? সে তো বাইরের মেয়ে। তিনি নিজেই কি মাকে সেভাবে দেখভাল করেছেন? না। আদনান সাফি পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজেন।

রাত দেড়টার দিকে আদনান সাফি ধরমর করে উঠে বসেন।

কি হল তোমার?

একটু কবরস্থানে যাব।

কেন?

মা মরেন নি, বেঁচে আছেন...।

কি বলছ?

ঠিকই বলছি। মার ডাক শুনলাম... স্পষ্ট...।

আদনান সাফি সবাইকে অবাক করে দিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে ছুটলেন একাই। রাত তখন দেড়টার বেশি বাজে। হতভম্ব স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইলেন দরজা ধরে। তিনি কি করবেন বুঝতে পারছেন না। এই পাগলামোর মানে কি। বাইরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি হচ্ছে।

boighar.com

কবরস্থানের গেট খোলাই ছিল। আদনান সাফিকেউদভ্রান্তের মত ঢুকতে দেখে একজন কবর খোদক তার সঙ্গ নিল।

স্যার কি হইছে?

তোমরা কেউ একজন আসো আমার সাথে। আমার মা বেঁচে আছেন।

মায়ের কবরটির সামনে এসে তিনি নিজেই কোদাল নিয়ে পাগলের মত মাটি সরাতে লাগলেন। নরম মাটি, সদ্য কবর দেয়া হয়েছে, দ্রুত মাটি সরে বাঁশ চাটাই বের হয়ে গেল... নিজ হাতেই দ্রুত সরালেন তিনি। কবর খোদক তরুণটিও হাত লাগাল বাঁশ চাটাই সরাতে। আরে একি? কবরের ভিতর সত্যি সত্যি মা বেঁচে আছেন! মা বসে আছেন কবরের কোনায় জড়োসড়ো হয়ে।

মা?

বাবা তুই আসছিস? আমাকে উঠা...।

মা মারে, মা... আমার হাত ধরো। প্রচণ্ড কষ্টে আদনান সাফির চোখে পানি এসে যায়।

তুই নিচে নেমে আমারে উঠা বাবা ... আমার উঠার শক্তি নাই। এখানে অনেক পানি জমে গেছে। দেখ।

সত্যিই তাই। বৃষ্টির পানি চুইয়ে চুইয়ে জমেছে। লাফ দিয়ে নামলেন আদনান সাফি কবরের ভিতর। পাঁজাকোলে করে মাকে তুলে নিলেন। মা একটা হাত দিয়ে শিশুর মত গলা জড়িয়ে ধরলেন আদনানের। বৃষ্টিতে চুল ভিজে গেছে মায়ের। কাফনের কাপড়টাও ভেজা। মা অল্প অল্প কাঁপছেন।

এই যে ভাই, আমার একটা হাত ধরেন।মাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে কবর থেকে উঠার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন কবর খোদক লোকটার দিকে।

লোকটাও এগিয়ে এল হাত ধরতে।

গেটে গাড়ির শব্দ শুনে শোভা, ঝন্টু, মন্টু ছুটে গেল নিচে।বাবা এসেছেন। তারা অবাক হয়ে দেখল বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। দু হাতে অদৃশ্য কিছু একটা ধরে আছেন তিনি। সারা গায়ে কাদা-পানি মাখা। হাসি মুখে বলে উঠলেন

দেখ দেখ মাকে নিয়ে এসেছি, মা বেঁচে আছেন। জলদি একটা শুকনো কাপড় টাপড় কিছু দাও... জলদি করো...।

পায়ের ছাপ

ক'দিন ধরেই ভোর বেলায় উঠার অভ্যেস হয়েছে কবির সাহেবের। তলপেটের চাপে ঘুম ভেঙে যায়। পরে আর ঘুম আসে না। যেমন আজও যথারীতি উঠেছেন, অবশ্য তার ভালই লাগে নতুন রুটিনটা। সকালের নতুন পেপারের ভাঁজ খুলেপড়ার মজাই আলাদা।

আজও সেই মজার মধ্যে ঢুকতে যাবেন। হঠাৎ চোখ গেল দরজার দিকে। ভিতরের দিকের দরজাটা খোলাই থাকে। তিনি সকালে উঠে খুলে দেন। ওখানে বেশ একটা পাঁচিল ঘেরা খোলা জায়গা। দরজার পাশ দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। ...

দরজার দিকে চোখ যেতেই তিনি দেখলেন কে যেন উঁকি দিল দরজা দিয়ে, উঁকি দিয়েই চট করে সরে গেল। 'কে?' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন? এত সকালে কারো উঠার কথা না। দোতলায় তার ছোটবোন থাকে। সে দশটার আগে উঠে না, তিনতলা খালি পড়ে আছে, কেউ থাকে না। আর নিচে কেউ উঠলে তিনি তো জানবেন সবার আগে। তবে কি চোর ঢুকলো?

তিনি চট করে উঠে এলেন। খোলা জায়গাটা দেখলেন সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। কোথাও কেউ নেই। চোর এলেও উঁকি দিয়ে এত দ্রুত পালাতে পারার কথা না। তখনই তার নজর পড়ল সিঁড়ির শেষ ধাপ ক'টায়। ভেঁজা পায়ে একটা বাচ্চার পায়ের ছাপ... যেন কোনো বাচ্চা ভেঁজা খালি পায়ে নেমে এসেছে। শেষ ধাপে এসে উঁকি মেরেছে। পায়ের ছাপে সেরকমটাই মনে হচ্ছে... কিন্তু এই দোতলা বাসায় কোনো বাচ্চা থাকে না। কবির সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন আশ্চর্য হয়ে ... তার সামনেই আস্তে আস্তে পায়ের ছাপগুলো শুকিয়ে গেল।

boighar.com

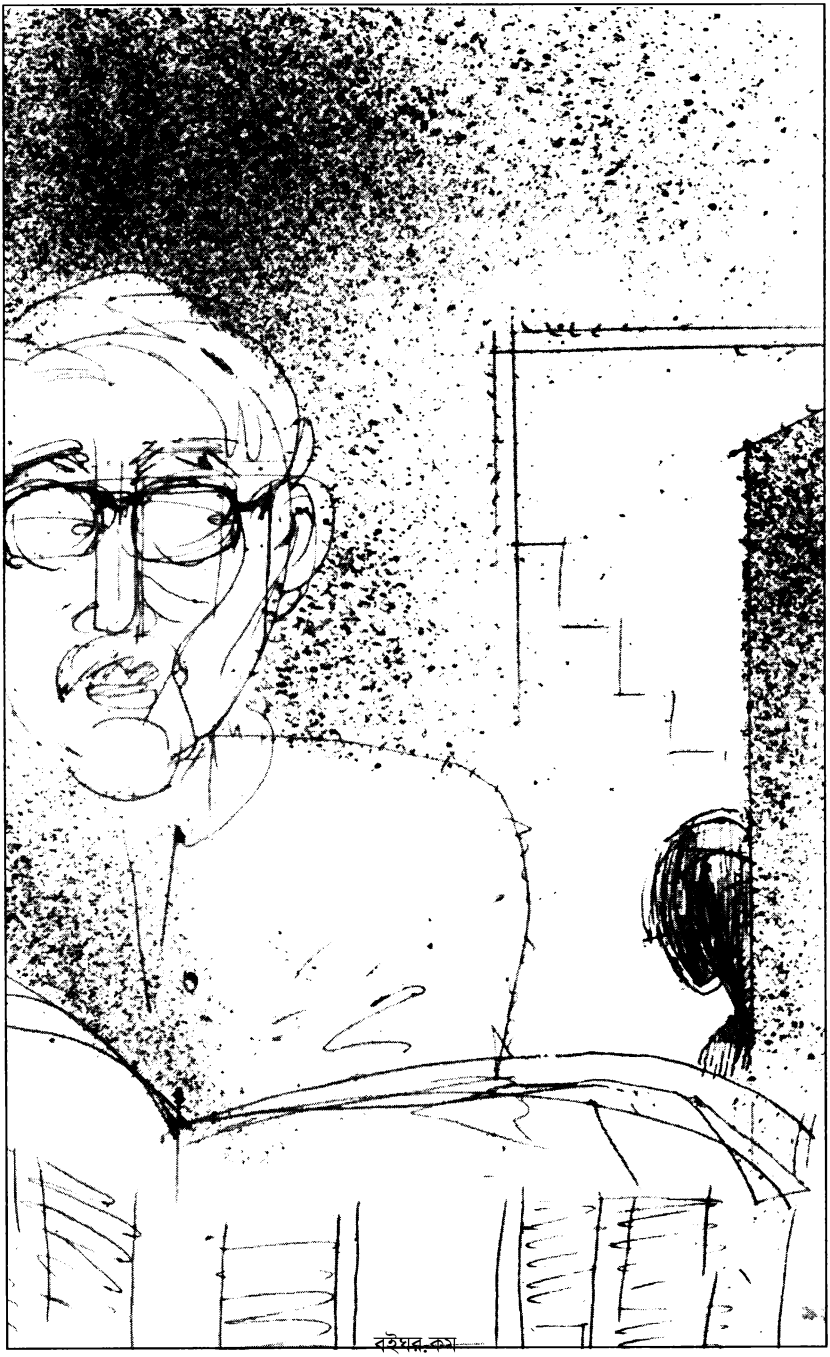

বইঘর.কম

এক সময় ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গেলেন।

ঠিক এক সপ্তাহ পর বিষয়টা আবার ঘটলো।

তিনি নতুন ভাঁজ করা পেপারটা ... যেটা হকার ভোর বেলা বাইরের মেইন গেট টপকে ছুঁড়ে ফেলে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি ভিতরের টিভি ঘরে বসেন। যেমনটা আজ বসেছেন। পেপারটা খুলতে যাবেন ঠিক তখন সেই দিনকার মত মনে হল কেউ উঁকি মেরেছে দরজায়! তিনি স্পষ্ট দেখলেন।

তিনি গতবারের মত 'কে?'বলে চিৎকার না করে দ্রুত উঠে গেলেন দরজার কাছে। না কেউ নেই...! কিন্তু সেই ভেঁজা পায়ের ছাপ আছে...ছাপটা আগের মত কোনো শিশুর না। মনে হচ্ছে আরেকটু বড় কোনো কিশোরের...। আগের মতই ছাপটা দেখে মনে হয়ে উপর থেকে পায়ের ছাপটা নেমে এসেছে। সে সিঁড়ি শেষ ধাপে থেমে উঁকি মেরেছে ভিতরের দিকে যেখানটায় কবির সাহেব বসে আছেন।

ক'দিন পর কবির সাহেব বিষয়টা আবারও ভুলে গেলেন।

এবং ঠিক এক সপ্তাহ পর কিংবা দু'একদিন, এদিক ওদিকও হতে পারে। বিষয়টা আবারও ঘটলো ... এবার পায়ের ছাপ আরো বড়। শুধু বড় বললে ভুল হবে, বেশ বড়... অস্বাভাবিক ধরনের বড়।

এবার বিষয়টা তিনি স্ত্রীকে বললেন। বড়রা বিষয়টা গুরুত্ব দিয়েই নিল। অপেক্ষাকৃত তরুণরাআড়ালে হাসাহাসি করল বড় চাচাকে নিয়ে। বুড়ো বয়সে চাচা ভূত দেখতে শুরু করেছে। স্ত্রী রেহানা অবশ্য একদিন তাকে প্রায় এক রকম জোর করে এক পীর বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ পীর বাবার অবশ্যঅতটা শানশওকত নেই, গরীবি হাল। একটা ভাঙা চেয়ারে বসে আছেন, আশেপাশে লোকজন নেই। পাশে একটা হুঁকো জ্বলছে। কবির সাহেব বহুদিন পর হুঁকো দেখে মুগ্ধ হলেন। সুন্দর একটা মিষ্টি তামাকের গন্ধ।

বাবা, এ আমার স্বামী।

পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। কোনো সমস্যা?

জি, একটু সমস্যা ...

boighar.com

কি সমস্যা?

ইয়ে... এই তুমি বলো না!

কবির সাহেব গুছিয়ে বললেন বিষয়টা। পীর বাবা হুঁকো টানা বন্ধ করে আগ্রহ নিয়ে শুনলেন পুরো ঘটনাটা। তাকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

তিনি খুক খুক করে কাশলেন। তারপর হুঁকো টানলেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ খুললেন,

পায়ের ছাপগুলো কোন মুখো ?

উল্টো না, সোজা মুখোই... একটা মানুষ নেমে আসলে যেমনটা ছাপ পড়ার কথা সিঁড়িতে, তেমনটাই।

হুঁম্... কিন্তু ভেঁজা ছাপ কেন? বিড় বিড় করে নিজের মনেই বলেন তিনি।

কি বারে হয়?

জি, প্রতি শনিবারে...

শনি পরিকল্পনা করে আর মঙ্গল কাজটা ঘটায়... বিড় বিড় করে নিজের মনে বলে পীর বাবা। আবার হুঁকো টানায় মনোযোগ দেয়। সুন্দর তামাকের গন্ধটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাবা কিছু বুঝলেন? স্ত্রী রেহানা প্রশ্ন করেন।

পীর বাবা কথা বলেন না। চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন ঝিম ধরে। কিছুক্ষণ তারপর বলেন-

না, বুঝি নাই...,বোঝার চেষ্টা করতেছি। মেয়ে, তুমি একটু ভিতরের ঘরে যাও। উনার সাথে আমি একা কথা বলি একটু...।

জি বাবা।

রেহানা উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন। হুঁকোর নলটা রেখে বৃদ্ধ পীর বাবা এবার স্পষ্ট চোখে তাকালেন কবিরের দিকে। কবিরের মনে হল রাগী চোখ এক জোড়া। ‘ তোমার ছেলেমেয়ে কয়জন? ’

জি, তিন ছেলে?

মেয়ে নাই?

জি না।

আছে... অবশ্যই আছে... আমি স্পষ্ট দেখলাম।

অস্বস্ত বোধ করেন কবির সাহেব। পীর বাবা কি বলতে চান!

আরেক নারীর গর্ভে তোমার এক সন্তান ছিল... মেয়ে শিশু... মনে পড়ে?

কবির সাহেব কুল কুল করে ঘামছেন। 'তুমি তারেবালতির পানিতেডুবায়া মারছ?' পীর বাবা ফিস ফিস করেবলেন। ' ... যাও বাড়ি যাও... আমার কাছে আর আইস না...'

পীর বাবা কি বললেন? ফেরার পথে রেহানা জানতে চান।

তেমন কিছু না... বললেন...। গাড়ি চালাতে চালাতে কথা খুঁজে পান না কবির সাহেব।

কি হল? কি বললেন?

বললেন ইয়ে ... ঠিক হয়ে যাবে।

আহ্ পরিষ্কার করে বলো না কি বললেন!

আসলে... তো- তোমাকে বলতে নিষেধ করেছেন। মিথ্যা বলেন কবির।

আচ্ছা থাক তাহলে, আর বলার দরকার নেই।... কিন্তু জিনিসটা বন্ধ হবেতো?

কি বন্ধ হবে?

মানে ঐ সিঁড়ি দিয়ে পায়ের ছাপ নেমে আসাটা?

বললেন তো হবে...

এরপর মাস খানেক কবির সাহেব ভালই ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন মনে হল কেউ উঁকি দিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন... তার শরীরের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ছোট্ট একটা মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট একটা লালফ্রক পরা, পানিতে চুপচুপে ভেঁজা। টপ টপ করে পানি পড়ছে। তার দিকে হাতে ইশারা দিয়ে ডাকল মেয়েটি... মন্ত্র মুগ্ধের মত উঠে গেলেন তিনি। মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেলাগল... তিনিও উঠতে

boighar.com

লাগলেন... ছোট্ট পায়ের ছাপ... উপরের দিকে উঠছে...তিনিও উঠছেন... পুরোনো আমলের সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে তিন তলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে।

পরদিন খবরের কাগজে ছোট্ট একটি নিউজ বের হল। তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে এক প্রবীণের করুণ মৃত্যু। খবরটা কাউকে স্পর্শ করল না। এই ঢাকা শহরে কত রকম মৃত্যুই তো হচ্ছে আজকাল।

লিফট

নতুন চাকরিটা শাহেদের বেশ পছন্দ হয়েছে। ষোল তলা বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে তার অফিস। নিজের রুমটাও দারুণ। জানালা দিয়ে পুরো ঢাকা শহর দেখা যায়। ইদানীং আরেকটা মজা শুরু হয়েছে। বস সব সময় তাকে কিছু বারতি কাজ দিয়ে যান। বলে –'শাহেদ কাজটা শেষ করে অফিস থেকে বের হইও...'। বারতি কাজ করতে শাহেদের ভালই লাগে, ভাল লাগার কারণটা অবশ্য অন্য জায়গায়। বারতি কাজটুকু করতে তাকে একটু বেশি সময় অফিসে থাকতে হয় । একে একে সবাই চলে যাওয়ার সময় বলে,

শাহেদ, যাচ্ছি। তুমি আছ?

হ্যাঁ। হাতের কাজটা শেষ করে বের হব।

আবার হয়ত আরেকজন উঁকি মারে তার দরজায়–

শাহেদ, যাচ্ছি। তুমি আছ?

হ্যাঁ। হাতের কাজটা শেষ করে বের হব।

শাহেদ হিসাব করে দেখেছে ... ' হ্যাঁ। হাতের কাজটা শেষ করে বের হব' এই কথাটা তাকে মোট সাতবার বলতে হয়। তারপর সবাই যখন চলে হয়ে যায়, সম্পূর্ণ অফিসে সে একা, তখন সে মেইন দরজা লক করে একটা সিগারেট ধরায়; নিজের রুমে বসে পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে থাকে ঢাকা শহরের দিকে। মনে হয় নিউইয়র্ক সিটি দেখছে সে, যদিও তার নিজের নিউইয়র্ক সিটি কখনো দেখা হয় নি। বারতি কাজের বিনিময়ে নিজের রুমে বসে চুরি করে করে সিগারেট খাওয়া (অফিসে সিগারেট খাওয়া স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ) তার দারুণ লাগে।

মাঝেমধ্যে কফি বানিয়ে খায়। সাথে আবার সিগারেট।

boighar.com

তারপর বের হতে হতে সাড়ে আটটা- ন'টা ...

এই চলছিল।

সেদিন বের হতে হতে নটা। অফিস লক করে। করিডোর ধরে হেঁটে আসছে লাইট নিভাতে নিভাতে। পিছনে অন্ধকার হচ্ছে ... যেন সে লাইট নিভিয়ে নিভিয়ে অন্ধকার তৈরি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে লিফটের দিকে। এই সময় তার একটু ভয় ভয় লাগে। কেউ নেই এত বড় বিল্ডিংটায়? সে একা একা ...পেছনের অন্ধকারটা শুধু সঙ্গী? তার শরীরের ভিতরে শিরশির করা একটা অনুভূতি কাজ করে।

লিফটের সামনে এসে বাটন চাপতেই লিফট খুলে যায় না। নিচ থেকে লিফট উঠে আসতে একটু সময় নেয়। এই সময়টুকুতে হাতের মোবাইল অন করে দাঁড়িয়ে থাকে শাহেদ। মোবাইলের স্ক্রিনের হালকা আলোয় সে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরেই লিফটটা খুলে যায়। লিফটের আলোয় করিডোরটা আলোকিত হয়ে উঠে।

আজও তাই হল। লিফটটা খুলে গেল। লিফটের আলোয় ভরে গেল করিডোরটা। লিফটের আয়নায় চোখ গেল শাহেদের বরাবরের মত। ধ্বক করে উঠল বুকটা। তার পেছনে আরেকটা মুখ!

সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকায় সে। কেউ নেই। সে একা। দ্রুত লিফটে উঠে দরজা লক করার বাটনটা চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা লক হয়ে যায়।

আজ যেন অনন্ত কাল লাগছে দরজা লক হতে। না দরজাটা লক হল... মানে লক হওয়ার জন্য দরজার ভারি পাল্লা দুটো এগিয়ে আসছে। এবং লক হওয়ার আগের মুহূর্তে আবার মুখটা দেখল সে এক ঝলক লিফটের বাইরে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে তার।

যে কাজ শাহেদ নিজেই খুব অপছন্দ করে আজ সেটাই করল। সিগারেট ধরাল একটা, লিফটের ভিতরে। আর কি আশ্চর্য তার মনে হল অনন্ত কাল ধরে লিফট নামছে তো নামছেই।

ছয় আর সাত তলার মাঝামাঝি এসে লিফটটা থেমে গেল। এর মানে কি? তারপর আস্তে করে ঝাঁকি খেয়ে লিফটটা আবার উপরের দিকে উঠতে

boighar.com

লাগল। হতভম্ব শাহেদ গ্রাউন্ডের বাটন টিপছে। কাজ হচ্ছে না। খুব ধীর গতিতে লিফটটা উপরের দিকে উঠছে তো উঠছেই... ।

... ষোল তলায় এসে থামল লিফটটা। শাহেদ টের পেল সে রীতিমত ঘামছে। এখন কি লিফটের দরজা আবার খুলবে ...সে আবার দেখবে সেই মুখটা ! দরজা খুলে গেল। অন্ধকার করিডোর... কোথাও কেউ নেই... । লিফট বন্ধ হল আবার নামতে লাগল নিচের দিকে।

এগার তলায় এসে থেমে গেল লিফটটা । দরজা খুলে গেল আপনা আপনি। শাহেদের কি হল, সে লিফট থেকে বেরিয়ে এল। শরীরে বোধ হয় অ্যাড্রেনালিন হরমোনের নিঃসারণ কমে আসছে ... তার সাহস ফিরে এসেছে। তার এক হাতে মোবাইলের টর্চটা অন করা অন্য হাতে প্রায় নিভে আসা সিগারেট। সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আরেকটা সিগারেট ধরাল। সিঁড়িটা বরং আলোকিত। প্রতিটা ফ্লোরে সিঁড়ির গোড়ায় একটা করে লাইট। দ্রুত নেমে আসছে শাহেদ। প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে সে। এক সঙ্গে দু'তিনটা করে সিড়ি টপকাচ্ছে।

শেষ সিঁড়ি টপকে আলোকিত গ্রাউন্ডে নেমে এল শাহেদ। তাকে দেখে এগিয়ে এল দারোয়ান। দারোয়ান তার চেনা প্রতিদিন রাত করে বের হয় বলে।

কি হল স্যার, সিঁড়ি দিয়া নামলেন যে!

লিফট গোলমাল করছে।

কি কন? লিফট তো জায়গা মতনই আছে... ঐ দেখেন।

শাহেদ তাকিয়ে দেখে লিফটটা গ্রাউন্ডে স্থির হয়ে আছে। দরজা খোলা। ভিতরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে মাথাটা কাত করে।

লিফটের ভিতর ঐটা কে?

কই কে? লিফট তো বন্ধ।

শাহেদ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে লিফটটা আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন অফিসে সোয়া পাঁচটার দিকে বস ঢুকলেন শাহেদের রুমে। হাতে একগাঁদা ফাইল।

শাহেদ, কাজটা শেষ করে অফিস থেকে বের হবে...

ইয়ে স্যার...

কিছু বলবে?

স্যার ছয়টার পর বারতি কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

মানে? বসের ভ্রু কুঁচকে গেল।

স্যার, ছয়টার পর আর আমার পক্ষে বাড়তি কাজ করা সম্ভব না। জোর দিয়েই কথাগুলো বলল শাহেদ আবার।

আচ্ছা।

ফাইলগুলো নিয়ে বের হয়ে গেলেন বস।

একটু বাদেই পিয়ন একটা হলুদ অফিসিয়াল খাম দিয়ে গেল শাহেদকে। শাহেদ খামটা না খুলে ওয়েস্টেজ বাস্কেটে ফেলে দিল। সে জানে ঐ খামে কি আছে। এই রকম পরিস্থিতিতে কি থাকে ঐ ধরনের খামের ভিতরে।

বস শরফুদ্দীন নিজেই নিজের রুমে বসে একা একা ফাইলগুলো সব ক্লিয়ার করলেন, কনফিডিন্সিয়াল ফাইল। এই করতে করতে ন'টা বেজে গেল। অফিস লক করে করিডোরের সব আলো নিভিয়ে লিফটের সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন ঘড়িতে সোয়া নটা বাজে। লিফটটা খুলে গেল। তিনি ঢুকতে যাবেন-তাকিয়ে দেখেন সামনে লিফটের আয়না তার পিছনে একটা মুখ। খুব পরিচিত একটা মুখ... কার মুখ? শাহেদ? শাহেদকে ছাঁটাই করেছেন ছটায়। সে চলে গেছে সাড়ে ছটায়। এখন বাজে সোয়া নয়। ঝট করে পিছন ফিরলেন তিনি... কেউ নেই। লিফটে ঢুকে দরজা লক করলেন। বুকের বাঁ ধারে ব্যথা করছে। ব্যথাটা দ্রুত ছড়াচ্ছে ... তিনি বুক চেপে ধরে লিফটের মেঝেতে বসে পড়লেন। লিফট হু হু করে নামছে। দু চোখ বন্ধ করে বুকের ব্যথাটা সামলানোর চেষ্টা করলেন...তখনই কেমন একটা শব্দ এল কানে। চোখ খুললেন তিনি... লিফটের বন্ধ দরজার কাছে দেখলেন একজোড়া অতিরিক্ত ফর্সা খালি পা, তার সামনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে। একটু আগেও লিফটের ভিতর তিনি একা ছিলেন।

boighar.com

তিনি হাঁ করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলেন। বন্ধ লিফটে একফোঁটা বাতাস নেই ...। লিফটটা ঝাঁকি খেয়ে গ্রাউন্ডে এসে থামল, বস শরফুদ্দীনও ঝাঁকি খেয়ে আস্তে করে কাত হয়ে পড়ে যেতে যেতে দেখলেন ফর্সা খালি পা দুটো লিফট থেকে বের হয়ে গেল। তিনি আর উঠলেন না।

বইঘর.কম

স্কুল ভ্যান

শুনছ?

শুনছি। কান খোলা আছে। বলো।

নাজিয়া আর স্কুল ভ্যানে করে স্কুলে যেতে চাচ্ছে না।

মানে?

শাহেদ বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পেপার পড়ছিল। এবার পেপারটা নামিয়ে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকায়।

ও স্কুল ভ্যানটা পছন্দ করছে না আর।

কিন্তু এই মুহূর্তে তো আর ওর জন্য আমি গাড়ি কিনতে পারছি না।

আহা! বিষয়টা গাড়ি নিয়ে নয়।

তাহলে?

ও চাচ্ছে ওকে আমি রিক্সায় করে নিয়ে যাই, ভ্যানে নয়।

তাই যাও।

বাহ্, আমার স্কুল নেই? তুমি মনে হচ্ছে ভুলে যাও আমি একটা স্কুলে চাকরি করি?

ও সরি সরি... হ্যাঁ তাইতো । তাহলে? সমস্যাটা ঠিক কি?

ওদের ভ্যানে একটা ছেলেকে তার ভয়।

ওফ থ্রি ফোরের বাচ্চাকে ভয়?

হাঁ। ও যে বাচ্চার কথা বলছে সে একটু বড়। এইটে পড়ে। ওদের সঙ্গেই যায়। ঐ ছেলেটা মনে হয় ওকে একটু জ্বালায়...

তাই নাকি? কেন জ্বালাবে? ঈভ টিজিং এর মামলা ঠুকে দাও।

উফ বিষয়টা ফাজলামো না।

তা ছেলেটা কি বলে?

তেমন কিছু না... আসলে আমি ছেলেটাকে দেখেছি। একটু বড়সড় গাপ্পু টাইপ ছেলেটা, আমার তো তাকে শান্তশিষ্টই মনে হল।

boighar.com

বইঘর.কম

নিশ্চয়ই লেজ বিশিষ্ট, না হলে তোমার মেয়ে ভয় পাবে কেন?

তোমার মেয়েটা হচ্ছে নরম টাইপ...

তারা আরো অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করল মেয়ের স্কুল সমস্যা নিয়ে। কিন্তু ফলপ্রসূ কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারল না। তবে তারা জানতে পারল না তাদের পুরো আলোচনাই তাদের ফোরে পড়া ছোট্ট মেয়ে নাজিয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনলো।

পরদিন সকালে যথারীতি ভ্যানে উঠতে খুব একটা আপত্তি করল না নাজিয়া। অবাক হলেন তার মা নাসরিন। মনে মনে খুশিই হলেন। সেই গাপ্পুটাইপ ছেলেটি ভ্যানের কোনায় চুপ চাপ বসে আছে। আরো দুটি মেয়ে আছে ভ্যানে। সামনে আরো দুজনকে তুলবে, তারপর সোজা স্কুলে।

নাজিয়ার ভয়টা অন্য জায়গায়। ফেরার সময় কিছু সময় সে আর মুকিত নামের এইটে পড়া ছেলেটা একা একা থাকে। ভ্যানটা যখন তেঁতুল তলার মোড়ে আসে তখন ছেলেটা চেঁচিয়ে ওঠে ' আঙ্কেল ভ্যান থামান ...'

'ভ্যান থামান ...' 'ভ্যান থামান ...' কথাটা ছেলেটা এত দ্রুত বলতে থাকে যে নাজিয়ার কানে লাগে।

কেন কি হইসে?

ছেলেটা তখন কেনি আঙ্গুল দেখায়। ভ্যানওলা খুবই বিরক্ত হয়। মুখে বলে ' ক্যান, স্কুলে সাইরা আইতে পার না?'

ছেলেটা চেঁচাতেই থাকে 'থামান থামান' তখন নাজিয়ার ভীষণ বিচ্ছিরি লাগে। এক সময় ভ্যানটা থামে। ছেলেটা গাছটার আড়ালে চলে যায়। ভ্যানওলা তখন একটা বিড়ি ধরায়। সব মিলিয়ে পরিবেশটা বাজে লাগে নাজিয়ার, ভয় ভয় লাগে। উপরে তেঁতুল গাছটার দিকে তাকালে ধ্বক করে ওঠে। গাছটা বিশাল আর কেমন যেন গাছের ডালগুলো ছড়িয়ে আছে। অনেকগুলো মানুষের হাতের মত।

যেন অনেকগুলো মানুষ দু হাত আকাশের দিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোন সময় হাতগুলো নামিয়ে আনবে।

কি হইল? পোলাডা গেল কই?

ভ্যানওলা বিড়িটা ফেলে এগিয়ে যায়। একটু পরেই ফিরে আসে... পোলাডা তো নাই!

boighar.com

নাই? নাজিয়া অবাক হয়। এইতো গাছটার আড়ালে গেল। তারপর...

ভ্যানওলা এদিক ওদিক খুঁজলো। সত্যি নাই। এখন উপায়? ভ্যানওলার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

অসম্ভব ভয় লাগছে নাজিয়ার । এখন কি হবে? ছেলেটা গেল কই? ভ্যানওলা তখনও এদিক ওদিক খুঁজছে।

নাজিয়া এখন কি করবে? তারও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা ফিরে এসে যদি দেখে সে নেই!

কি করি কও তো? ভ্যানওলা অসহায়ের মত নাজিয়াকে বলে।

আঙ্কেল, স্কুলে ফোন করেন।

ঠিক বলছো... না, আগে তোমার মা'রে করি।

ভ্যানওলার কাছে সব গার্জেনদের ফোন নাম্বার আছে।

ভ্যানওলা যখন নাজিয়ার মাকে ফোন করছিল তখন একটা চিৎকার কানে এল। নাজিয়ার মনে হল সেই ছেলেটার গলা। কিন্তু চিৎকারটা ঠিক কোন দিক থেকে এল বোঝা গেল না।

এদিকে নাজিয়ার মা চলে এসেছেন। যাক নাজিয়া বিপদমুক্ত। ভ্যানওলা স্কুলেও ফোন দিয়েছে। সেই ছেলের বাবা-মাকেও ফোন দিয়েছে। সবাই চলে এসেছেন। শুধু ছেলেটি নেই।

তুমি ওরে নামতে দিলা ক্যান?

বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ছেলেটির বাবা।

কি করুম? সে তো ঝামেলা করে। ঐ তো ঐ মেয়েরে জিগান।

ভ্যানওলা নাজিয়াকে দেখায়। এই সময় সেই আর্ত চিৎকারটা সবাই শুনে। হ্যাঁ ছেলেটির চিৎকার– কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় ছেলেটি? আর তখনই নাজিয়ার চোখ পড়ে ... বুকের ভিতরটা ধ্বক করে ওঠে। ছেলেটি তেঁতুল গাছের মগডালে উল্টো হয়ে ঝুলছে।

ঐ যে... নাজিয়া কোনমতে বলে।

সবাই উপরে তাকিয়ে একসঙ্গে আর্ত চিৎকার দিয়ে ওঠে।

মুকিত নামের ছেলেটিকে তেঁতুল গাছ থেকে নামাতে বহু ঝামেলা হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে মই উঠিয়ে তাকে নামাতে বহু কসরৎ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন তাকে নামানো হল তখন দেখা

গেল তার মুখ দিয়ে ফ্যানা ভাংছে আর চোখ দুটো টকটকে লাল। দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে কাছাকাছি একটা ক্লিনিকে নেয়া হল। নাজিয়ারাও ছিল ওদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল প্রায়।

রাতে বিছানায় সব কাহিনী শুনে নাজিয়ার বাবা শাহেদ সবজান্তার মত মাথা নাড়লেন,

বুঝেছি

কি বুঝেছ?

ঐ ছেলেটাকে আসলে পেত্নিতে ধরেছে।

উফ ... কি যে একটা বলো না। এই ঢাকা শহরে পেত্নি আসবে কোত্থেকে?

আছে আছে গ্রাম গঞ্জের পেত্নিরা এখন সব শহর কেন্দ্রিক হয়েছে ...

আচ্ছা তা না হয় হল... কিন্তু ঐ বাচ্চাটাকে ধরবে কেন?

কারণ বাচ্চাটা তেঁতুল গাছের নিচে পেচ্ছাপ করতে বসেছিল আর তেঁতুল গাছেই পেত্নিরা থাকে। ওরা চুল ফেলে রাখে গাছের নিচে। তারপর কেউ ওদের চুলে পেচ্ছাপ করলেই ক্যাক করে ধরে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে নাসরিন।

' উফ তুমি যে কি সব বল না...বাচ্চাদের মত'

কি? আমি বাচ্চাদের মত বললাম? তাহলে একটা ঘটনা বলি তোমাকে। আমি তখন সদ্য তরুণ গ্রামে থাকি। একদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে সাইকেলে ফিরছিলাম ... একটা বড় তেঁতুল গাছের নিচ দিয়ে আসতে হয়...

ঐ ঘটনার পর দু দিন স্কুলে গেল না নাজিয়া। ভ্যানওলা বলেছে ঐ স্কুলে আর সে ভ্যান চালাবে না। কারণ ঐ ছেলের বাবা-মা তার সাথে নাকি যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে।

তৃতীয় দিনে নতুন এক ভ্যানওলা এল। ভ্যানে উঠতে গিয়ে নাজিয়া দেখে সবাই আছে শুধু মুকিত নেই। সে নাকি এখনো সুস্থ হয় নি। তাকে নিয়ে তাদের স্কুলে নানা আলোচনা। কেউ বলে জীনে তুলে নিয়েছিল, কেউ বলে পরীতে ধরেছিল। আসলে যে কি হয়েছিল কে জানে।

boighar.com

সপ্তম দিনে ভ্যানে মুকিতকে পাওয়া গেল। ভ্যানের কোনে জরসর হয়ে বসে আছে। কেউ অবশ্য তাকে ঐ বিষয় নিয়ে ঘাঁটাল না।

ফেরার পথে সেই তেঁতুল তলার নিচ দিয়ে আসছিল ওরা। হঠাৎ ভ্যান থেমে গেল। কি হল? ভ্যানওলা কিছু না বলে আড়ালে চলে গেল। চেঁচিয়ে উঠল মুকিত - না না আঙ্কেল... না না '।

কিন্তু ততক্ষণে ভ্যানওলা আঙ্কেল অদৃশ্য।

এদিকে নাজিয়া অবাক হয়ে দেখে মুকিত থরথর করে কাঁপছে। সম্পূর্ণ মেয়েলি গলায় বলল–

' ওরে না করো এখনো... নইলে কিন্তু বিপদ হবে'।

নাজিয়া অবাক হয়ে দেখে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা মুকিতের পেন্টের ফাঁক দিয়ে তিরতির করে পানি পড়ছে। সে ভ্যানের ভিতর পেচ্ছাপ করে দিয়েছে। ভয়ের চেয়ে ঘেন্না বেশি হল নাজিয়ার। সে জড়োসড়ো হয়ে একেবারে কোনায় সরে এল।

ভ্যানওলা অবশ্য একটু বাদেই এল। কেমন যেন এলোমেলো পায়ে হেঁটে এল। তারপর ভ্যান চালাতে লাগলো অসম্ভব জোরে। ভীষণ ভয় লাগছে নাজিয়ার। ' আঙ্কেল, একটু আস্তে চালান ' চেঁচিয়ে বলে নাজিয়া।

তাতে কাজ হয় না। আর মুকিত কেমন জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে ভ্যানের কোনায়। নাজিয়ার মনে হয় ছেলেটা থরথর করে কাঁপছে। সে বলেই ফেলে,

কি হয়েছে তোমার?

মুকিত পরিষ্কার একটা মেয়ের গলায় বলে,

' তুমি ভ্যান থেকে নেমে যাও'।

কেন?

ও ভাল না...।

ও কে? ভ্যানওলা ?

না। ওর ভিতর যে ঢুকেছে।

কার কথা বলছ?

আহ্ বলছি নেমে যাও।

নাজিয়া খেয়াল করল ভ্যানটা টার্ণ নিয়ে অন্য পথে যাচ্ছে! নাজিয়ার কি যে হল আর দেরি করল না। ভ্যানটা দ্বিতীয়বার টার্ন নেয়ার সময় স্পিড একটু কমতেই তার ব্যাগ নিয়ে ভ্যান থেকে লাফ দিল চোখ বন্ধ করে।

তবে নাজিয়া টের পেল না। তার পিছন পিছন আরেকজন কেউ লাফ দিল ভ্যান থেকে, সেটা অবশ্যই মুকিত নয়, অন্য কেউ!

নাজিয়া যখন বাসায় পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একা একাই কিভাবে পৌছাল নাজিয়ার মার জানার কথা না। তিনি তার খোঁজে বের হতে যাচ্ছিলেন তখনই দেখলেন... মেয়েটা একা একাই এসে হাজির হল। চুল উস্কু খুস্কো, স্কুলের ব্যাগ মাটিতে গড়াচ্ছে। চোখ লাল।

একি অবস্থা তোর? কি হয়েছে?

স্পষ্ট ভরাট পুরুষের গলায় নাজিয়া বলল– " কিছু হয় নাই !"

boighar.com

মায়া

তারা দুজনই চাকুরিজীবী। তাদের একটাই মাত্র ছেলে, অলি। ও' লেভেলে পড়ে। আর একটা কাজের মেয়ে কত আর বয়স নয় দশ হবে। স্কুলে পড়লে ক্লাস ফোরে পড়ত হয়ত। গ্রাম থেকে আনা এই গরিব ঘরের মেয়েটার সারা গায়ে মারের দাগ। মায়া নামের এই মেয়েটি অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তার গায়ের দাগগুলো যাতে কেউ না দেখে। কিছু গরম ছেনির ছ্যাঁকার দাগও আছে। এ সবই বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে পাওয়া। কিছু কিছু বাড়ির কর্তারও আছে। আজও তারা ফিরে এলে একটা কিছু হবে। কারণ আজও মায়া একটা কা- করেছে মানে ঘটনাটি ঘটে গেছে...তার অজান্তেই কিংবা হতে পারে ঘটনাটি ঘটিয়েছে অলি... ড্রইংরুমের কাচের দামী অ্যাস্ট্রেটি ভেঙে ফেলেছে। অলি ওদের ও'লেভেলে পড়ুয়া একমাত্র ছেলে। মায়ার ইদানিং মনে হচ্ছে এই ভাঙাভাঙির কাজগুলো করে আসেলে অলি! দামি একটা কিছু ভেঙে ফেলা তারপর দোষটা ফেলে মায়ার উপর। তারপর যখন মায়াকে এলোপাতাড়িভাবে মারা হয় তখন সে আড়াল থেকে উপভোগ করে।

সোয়া সাতটার দিকে তারা এলেন। আসা মাত্র অলি নালিশ করল অ্যাস্ট্রে ভাঙার ব্যাপারটি। মায়া ভাবল প্রতিবাদ করবে কিন্তু পরে ভেবে দেখল প্রতিবাদ করে লাভ নেই। ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না।

ঠিক তখনই মায়ার দেশ থেকে তার বাবা এল। মায়ার বাবাকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেয়া হয় না। নিচের গ্যারেজে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল মায়া।

কিরে মা, কেমুন আছস?

ভাল না বাজান। আমারে নিয়া যাও...এরা খালি মারে মারে।

boighar.com

বাবা রহমত আলি মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে টের পান জায়গায় জায়গায় নানান রকম দাগ।

বাবা, আমারে আইজকা নিবা?

হুঁম, আইজাকই নিমু... এখনই নিমু...চল।

ঐ মিয়া, খাড়াও খাড়াও।

তারা দুজনেই ফিরে দেখে বাড়ির দারোয়ান পিছনে দাঁড়ানো। কই যাও মেয়ে নিয়া?

আমার মেয়েরে এইখানে আর রাখুম না।

সেইটা বেগম সাহেবরে বইলা নিবা না ?

তার দরকার নাই। আপনেই বইলা দিয়েন।

আরে খাড়াও খাড়াও... অতো সোজা না।

নিচ থেকে ফোন লাগায় দারোয়ান ।

খুব দ্রুতই নেমে আসেন বেগম সাহেব আর কর্তা।

কি ব্যাপার ? মায়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

জে। ও আর এই খানে থাকতে চায় না।

না। এটা বললে তো হবে না। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে। এর হিসেব নিকেষ শেষ করে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে তারপর যাবে ।

রহমত আলি কথা খুঁজে পায় না।

খালাম্মা, মাফ কইরা দেন। ওরে নিয়া যাই।

না। সেটা সম্ভব না। এই মায়া, তুই উপরে যা।

মায়া উপরে যায় না মাথা গোজ করে দাঁড়িয়ে থাকে ।

'শোন রহমত মিয়া আজও সে একটা দামী জিনিস ভেঙেছে । আমার ধারণা এগুলো সে ইচ্ছে করেই করে। তোমার মেয়ের তিন মাসের বেতন পাওনা হয়েছিল। সবই আমি কেটে রাখব কারণ গত তিন মাসে সে আমার যা ক্ষতি করেছে সে আমি জানি।

রহমত আলি অসহায়ের মত তাকায় সাহেবের দিকে। তিনি কোন কথা বলছেন না। সিগারেট ধরিয়ে তেরচা ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ছেন আর রহমত আলীকে মাপছেন। হয়ত কিছু বলবেন এবং বললেনও,

এই, তুমি ওকে নিয়ে উপরে যাও তো! আমি দেখছি।

মায়ার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে লিফটে উঠলেন বেগম সাহেব।

এই যে বুড়া মিয়া... তুমি তো একটা ফ্রড ... আমি তো খবর পাইছি তুমি গ্রামে ভূত-প্রেতের ব্যবসা করতে? নকল ভূত সেজে মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকাপয়সা হাতাতে। মেয়েটাকেও কি সেই ট্রেনিং দিয়েছ?

জি না... কম বয়সে কিছু ভুল করছি পেটের তাগিদে... এখন এইসব বাদ দিছি।

শোন তোমার ঐ কেসে আমি কিন্তু এখনো তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি।

জি পারেন। আপনেরা ক্ষেমতাবান–সবই পারেন।

তাহলে এখানে আর ভেজাল না করে বিদেয় হও।

এই দারোয়ান গেট লাগাও।

বলে গটগট করে খোলা লিফটার ভিতরে ঢুকে যান সাহেব। এগিয়ে আসে দারোয়ান 'এই মিয়া উঠ '।

ভাইজান এক গেলাস পানি খাওন যায়?

যাইব না কেন? ঢাকা শহরে পানির অভাব নাই। দোকানে দোকানে পানি। ফিল্টার পানি, এক টাকা দিবা, সাথে সাথে পানি। যাও যাও বাইরাও... গেট লাগামু...।

গেটের বাইরে এসে রহমত আলীর নিজের বড় অসহায় লাগে। বাড়িটার দিকে তাকায় আটতলা বিশাল বাড়ি। তার সাত তলায় থাকে তার মেয়েটা। পুরো বাড়িও এই সাহেবের, সেরকমই শুনেছে। সাত তলায় সে থাকে বাকিগুলো সব ভাড়া। গাড়ি আছে দুইটা ... টাকার অভাব নেই। তারপরও তার মেয়েটার উপর এত অত্যাচার। মেয়েটাকে দিল না পর্যন্ত। কিন্তু রহমত আলী ঠিক করেছে মেয়েকে না নিয়ে সে যাবে না। কিছুতেই না। কিন্তু কিভাবে?

তার মনে পড়ে। তরুণ বয়সে সে জিনের খেলা দেখাতে। সবাই জানত তার পালা জিন আছে ... সেই জিনের অনেক ক্ষমতা, ভয় পেত

boighar.com

সবাই। আসলে কিছু না, কিছু অল্প বয়স্ক সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সে আগেই প্রস্তুত থাকত। তারপর একবার ধরা পড়ে গেল, জেল জরিমানা হল। জেল থেকে বের হয়ে সে ভালমানুষ। এখন সেই দিন নাই। বয়স হয়েছে দারিদ্র্য হয়েছে নিত্যসঙ্গী... যে কারণে মেয়েটাকে এই শহরে দেয়া।

অসম্ভব পিপাসা পেয়েছে রহমত আলীর। কোথাও পানি পেল না। হঠাৎ তার নজরে গেল একটা ছাপড়া মসজিদের মত বাড়ি গাছপালায় ঢাকা। তার সামনে একচিলতে জমিন। সেখানে একটা কল থেকে ছরছর করে পানি পড়ছে।

সেখানে ঢুকে পানি খেল। কলটা বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিছুতেই বন্ধ হল না ছর ছর করে পানি পড়ছেই। তারপরও চেষ্টা চরিত্র করে কলটা বন্ধ করল রহমত আলী। উপর থেকে চাপ দিয়ে প্যাঁচটা ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরালে কলটা বন্ধ হয়। কিন্তু রহমত আলী ভিতরে ভিতরে অবাক হল– এই কলের প্যাঁচটা তাহলে উল্টো।

পানি খেয়ে যখন উঠে দাঁড়াল তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। ঠিক তার পিছনে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে বেশ লম্বা খালি গা। লোমশ শরীর। লুঙ্গিটা হাঁটুর একটু নিচে। তবে পা দুটো উল্টো ...মাথা নেই...। রহমত আলী সাহসী লোক। সে যখন ভূতের খেলা দেখাত তখন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যা ব্যাখ্যার অতীত। রহমত আলী অবশ্য তার লোকজনেরই কাণ্ড বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আজও সেই রকম কিছু একটা ভেবে সে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে। পায়ের পাতা দুটো উল্টো তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি লোকটা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে? মাথা নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে মাথা দেখা যাচ্ছে না? তখনই ফিসফিস করে লোকটা কথা বলল,

রহমত আলী ... নেয়া শুরু করেন।

কি নেয়া শুরু করব?

আমারে আপনার ভিতরে নেন...

আমি আপনেরে আমার ভিতরে কিভাবে নিব?

এক সময় তো নিতেন।

সেইটা তো ছিল বুজরুকি... ছেলেপেলের সাহায্য নিতাম...

তারা তো ছেলেপেলে ছিল না। তারা ছিল আমার মত... নেন নেন জলদি আমারে ভিতরে নেন...আপনার মেয়েকে বাঁচাইতে হবে না দেরি করবেন না...

রহমত আলী অস্বস্তি নিয়ে খেয়াল করলেন অদ্ভুত মাথা নাই লোকটা তার দিকে হেঁটে আসছে... চারিদিকে একটা বিশ্রী কটু গন্ধ... ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনলেন... খট খট... লোকটা হেঁটে আসছে মানুষের পায়ে কিন্তু শব্দ হচ্ছে খট... খট...খট।

মায়াকে খেতে দিয়েছ কিছু?

না পাগল... হারামজাদি আজ উপোস থাকবে। রান্নাঘরে আটকে রেখেছি।

ভাল করেছ। কিন্তু ম্যাচটা তো লাগবে... প্লিজ একটু নিয়ে আসবে?

উফ কতবার বলেছি একটা লাইটার কিনে রাখতে। পার না? ঐ যে চাবি। যাও ম্যাচটা এনে রান্নাঘরটা আবার লক করে দিও।

চাবি নিয়ে এগিয়ে যান সালমত খান রান্নাঘরের দিকে। তার পকেটে ম্যাচ ঠিকই আছে। তিনি রান্নাঘরে যান অন্য উদ্দেশ্যে। আজকেই বা সেটা বাদ যাবে কেন? রান্নাঘরের দরজা খুলে অবাক হলেন মেয়েটি নেই। এদিক ওদিক তাকালেন অবাক হয়ে। তারপর যা দেখলেন তাতে বুকটা হিম হয়ে গেল। চুলার কাছে দাঁড়িয়ে রহমত আলী হাসি মুখে।

তাকে দেখে এগিয়ে এল রহমত আলি,

তু-তুমি এখানে ঢুকলে কিভাবে?

আমার মেয়েরে নিতে ঢুকছি... আপনি এত রাতে এখানে কি বিষয়? আগুনের খোঁজে আইছ? ম্যাচ তো তোমার পকেটেই আছে। বলতে বলতেই দপ করে পকেটের ভিতর ম্যাচটা জ্বলে উঠল, যেন একসঙ্গে সবগুলো কাঠি জ্বলে উঠল। প্রচণ্ড ভয়ে হতভম্ব সালমত খান হাতের থাবা দিয়ে আগুনটা নিভানোর চেষ্টা করলেন... আগুন নিভেছে বটে তবে নাইলনের প্যান্ট তার পায়ের চামড়ার সঙ্গে দগদগে ঘায়ের মত হয়ে লেগে গেছে। তার প্রচণ্ড চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে মা আর ছেলে অলি।

boighar.com

কি হচ্ছে এসব?

রান্নাঘরে রহমত আলীকে দেখে দুজনেই হতভম্ব। মেঝেতে সালমত খান শুয়ে কাতরাচ্ছেন। 'মেয়েরে নিতে আইসা দেখেন তো কত ঝামেলা!' হাসি মুখে বলে রহমত আলি।

ঢোঁক গিলেন মিসেস সালমাত খান। অসম্ভব ব্যাপার– মেয়েটি ঘরে নেই কিন্তু ওর বাবা ... ঘরে ঢুকলো কিভাবে? হঠাৎ নজরে গেল চুলাটা জ্বলছে তার উপর ছেনি দেয়া, সেটা টকটকে লাল হয়ে আছে।

এই ছেলে, এদিকে আস। আমার কাছে আস । অলির উদ্দেশে বলে রহমত আলী।

এই তু-তুমি ঘরে ঢুকলে কিভাবে? আমি পু-পুলিশ ডাকব।

ডাকেন ডাকেন... জলদি ডাকেন ... এই ছেলে...

অলি বাধ্য ছেলের মত রহমত আলীর কাছে যায়।

তোমার বাপ-মারে বল তো আমার মেয়ে যে জিনিসপত্র ভাঙতো আসলে সেগুলি কে ভাঙতো?

আমি... বিড়বিড় করে বলে অলি 'আসলে আমি ভাঙতাম, দোষ দিতাম মায়ার'

হঠাৎ আর্ত চিৎকার দিয়ে ওঠে অলি। মিসেস সালমান দেখেন রহমত আলীর হাতে লাল হওয়া সেই ছেনিটা আর অলির পেছন থেকে ধোঁয়ার মত কিছু উঠছে... চামড়া পোড়ার গন্ধ! ... আর তখনই ঘুমটা ভেঙে যায় মিসেস সালমানের। বুকটা ধ্বক ধ্বক করছে। তাও ভাল এটা একটা স্বপ্ন ছিল। কিন্তু চামড়া পোড়ার গন্ধটা আছে। পাশে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে মিঃ সালমান। ওর ঘুমটা বড্ড বিশ্রী। কি মনে হল তার, উঠে বসলেন। রান্নাঘরে একটু যাওয়া যাক। মেয়েটার একটু খোঁজ নেয়া যাক। রান্নাঘরের তালা খুলতে গিয়ে অবাক হলেন মিসেস সালমান। তালা খোলা। রান্নাঘরে কেউ নেই। সাদা টাইলসে ঘোড়ার খুড়ের দাগ! মিসেস সালমান খেয়াল করলেন– সারা ঘরময় খুড়ের দাগ। কাদামাখা দু পায়ে কোন ঘোড়া যেন সারা ঘরময় হেঁটেছে। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে পা দুটো গেছে ছেলের ঘরের দিকে।

ছেলের ঘরটা খোলা। ছেলে সাধারণত ঘর খোলা রেখে ঘুমায় না। আজ যে খোলা রাখল। ভয়ে ভয়ে তার ঘরে ঢুকলেন মিসেস সালমান। ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ নেই। ...শুধু ...শুধু কাপবোর্ডের সামনের ঝোলানো পর্দার তল দিয়ে একজোড়া ঘোড়ার পা দেখা যাচ্ছে। মিসেস সালমান হাঁটুতে জোর হারিয়ে ফেললেন। বসে পড়লেন মেঝেতে। তার দম আটকে আসছে। চিৎকার করে ছেলেকে ডাকার চেষ্টা করলেন গলা দিয়ে কেমন একটা ফ্যাশফ্যাশে আওয়াজ বের হল। এ সময় দেখলেন ছেলের বিছানার উপর উঠে বসেছে মায়া।

খালাম্মা, কি হইছে আপনার?

আআ...আআ... মুখ দিয়ে জন্তুর মত শব্দ বের হয়...তার।

তবে কি মায়াই ছেলের বিছানায় এতক্ষণ শুয়ে ছিল? মেয়েটাকে এত সুন্দর লাগছে কেন? তিনি ভুল দেখেছেন? তাহলে তার ছেলে কই? তিনি শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার করলেন ... তখনই কাপবোর্ডের পর্দা সরিয়ে বের হয়ে এল ঘোড়ার পাওলা প্রাণীটি।

গ্রামের মেঠোপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে বাবা রহমত আলী আর মেয়ে মায়া। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। নিঝুম গ্রামের পথ অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে। বাবা আর মেয়েকে তারপরও তারা আনন্দিত, ক্লান্তি তাদের স্পর্শ করেনি।

বাবা, তুমি আমারে ঐ আজাবখানা থাইকা বাইর করলা ক্যামনে?

আমি করি নাই ।

তাইলে কে করছে?

আমার পালা ভূতেরা করছে।

তুমি তো কইছিলা ঐ সব মিছা।

আমি তো তাই ভাবতাম... এখন দেখি।

কি দেখ? রহমত আলী কথা বলে না, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের পাশ দিয়ে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে যায় ঝোপঝাড় ভেঙে। তাদের দেখা যায় না তবে তাদের খুড়ের আওয়াজ আর বাতাসের ঝাপটা দুজনেই টের

boighar.com

পায়। কেউ কিছু বলে না। আবার হাঁটতে শুরু করে মেঠো পথ ধরে । আকাশের চাঁদ হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে তাদের ফিরে আসার পথ আলোকিত করে দেয়, যেন এটাই নিয়ম।

পাইরেটস

শোয়ার আগে দোতলা ডুপ্লেক্স বাড়ির সব সদর দরজা বন্ধ আছে কিনা তা তৌফিক সাহেব নিজেই চেক করেন। দরজা জানালা অবশ্য বন্ধই থাকে। কাজের লোকরাই বন্ধ করে শুয়ে পড়ে ।

সবার শেষে ঘুমুতে যান বলে তৌফিক সাহেব উপর নিচ একটা চক্কর দেন। তার একটা ভয় আছে, সেটা হচ্ছে এই ডুপ্লেক্স বাড়িগুলো হয়েছে তুরাগ নদীর ধারে। টানা অনেকগুলো বাড়ি। পাশাপাশি ইনডিভিজ্যুয়াল। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে ছোট্ট সবুজ চাইনিজ ঘাসের লন আছে আর একটা করে নারকেল গাছ। গাছগুলো আনা হয়েছে মালয়েশিয়া থেকে। কেন বাবা, দেশে নারকেল গাছ নেই? তারপরেও তৌফিক সাহেব খুশি। রিটায়ার্ড করার পর তার সঞ্চিত টাকা দিয়ে এই বাড়ি কিনেছেন। প্রবাস ছেলে-মেয়েরা আপত্তি করেছে । শহর থেকে এত দূরে হোক না ডুপলেক্স বাড়ি, দরকার কি? কে দেখবে তাদের? তৌফিক সাহেব তাদের আপত্তি কানে তুলেন নি। তার জীবনে সমস্ত সিদ্ধান্ত তিনি একাই নিয়েছেন। কখনো কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে হয় না সে কারণে তিনি জিতেছেনও, তিনি যখন এই বাড়ি কিনেন তখন তাকে দিতে হয়েছিল সত্তর লাক টাকা। আর এখন বছরখানেকের মাথায় এই বাড়ি দুই কোটি টাকার উপরে। কিন্তু সিকিউরিটির ব্যাপারটায় তিনি একটু সন্দিহান যদি পাশের নদী দিয়ে জলপথে একদল ডাকাত এসে চুপেচাপে ঢুকে পড়ে কিছু করার আছে? এবং ডাকাতির জন্য এ বাড়িটা সবচে উপাদেয় হবে। তৌফিক সাহেব আর তার স্ত্রী থাকেন আর ছেলেমেয়ে সবাই বিদেশে। দেশে আদৌ আসবে বলে মনে হয় না। আর দুজন কাজের লোক আছে। ব্যস এইতো তাদের সংসার।

boighar.com

বইঘর

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে ড্রইংরুমে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়ালেন। যথারীতি দরজা বন্ধ। তারপরও তিনি গোল নবটা টেনে দেখলেন লকটা ঠিকমত লেগেছে কিনা। রুটিন চেক সেরে ফিরে যাবেন তখনই সেই ভাবনাটা আবার এল। অস্বস্তিকর একটা ভাবনা ক'দিন ধরেই তার এই সমস্যাটা হচ্ছে। ড্রইংরুমের দক্ষিণ কোনাটা খালি। প্রতি কোনায় কিছু না কিছু তার স্ত্রী এন্টিক শো পিস বা ঐ জাতীয় কিছু রেখেছে। কিন্তু ঐ কোনাটা খালি। আর প্রতিবারই যখন এ কোনাটার দিকে চোখ যায় তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় 'তৌফিক সাহেবের। তার মনে হয় তিনি কিছু দেখতে পাবেন ঐ কোনাটায়... সেটা কি? তিনি নিজেও জানেন না কি তবে জীবন্ত কিছু ...এবং কেন জানি তার মনে হয় ভাল কিছু তিনি দেখবেন না। তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন তৌফিক' তুমি ঐ কোনাটায় ঠিক কি দেখতে চাও?'

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

' পারছ ... পারছ... তোমার কল্পনায় যেটা আছে সেটা বল'

মানে একটা বামন টাইপ...

' মানুষ?'

না মানুষের মত তবে মানুষ না... চোখ গোল বড় বড় বেশ বড় যেন কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে।

' আর নাকটা অতিরিক্ত লম্বা ঠোটের উপর ঝুলে পড়েছে'।

ঠিক তাই।

' হাত-পাগুলো বাঁকা বাঁকা ... তবে লোমশ'

এতো মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু।

' কিন্তু এই অদ্ভুত কল্পনা তোমার মাথায় এল কি করে?'

ছোটবেলায় ভূত-প্রেতের বই বেশি পড়তাম... তখন কল্পনায় যে অপার্থিব চিন্তাটা মাথায় আসত সেটাই হঠাৎ ফিরে এসেছে।

তৌফিক সাহেব এর সেই ভাবনাটা এল... সেই অদ্ভুত জিনিসটি ঐ কোনায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে? তিনি ঝট করে ঘুরে দাঁড়াতে যাবেন। তখন পা ঘষটানোর একটা শব্দ পেলেন। কোন সন্দেহ নেই। সেই কোনাটা থেকেই শব্দটা আসছে... পা ঘষটে ঘষটে কেউ এগিয়ে আসছে

boighar.com

তার দিকে। সেই সঙ্গে বড় করে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়ার শব্দ! কিন্তু এটা কি করে সম্ভব একটু আগেও তো ঐ কোনাটা তিনি খালি দেখেছেন। এবং এখন তিনি ওখান থেকে কিছু একটা শব্দ পাচ্ছেন! তিনি ভয় পাচ্ছেন? ভয়টা ভাঙার জন্য তিনি ঠিক করলেন ঘুরে দাঁড়াবেন। ঠিক তখনই ঘুষঘুষে একটা চাপা হাসির শব্দ পেলেন তিনি। তিনি ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন, পারলেন না। তার পা দুটো যেন কংক্রিটের মেঝেতে গেঁথে গেছে। পা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা। সাথে কেমন চাপ একটা হাসির শব্দ। কুলকুল করে ঘামছেন তৌফিক সাহেব। তখনই তিনি নিজেকে আবার প্রশ্ন করলেন,

' তৌফিক তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

বুঝতে পারছি না।

' তুমি ঘুরে দাঁড়াচ্ছ না কেন?'

চেষ্টা করছি পারছি না তো।

'এটা তোমার মনের ভুল ...'

হবে হয়ত।

' আর তোমার ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। তুমি যাকে কল্পনা করেছ তাকেই দেখতে পাবে। এক দিক দিয়ে তুমি ভাগ্যবান। সাধারণত মানুষের কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কখনো মিলে না। তোমার ক্ষেত্রে মিলে গেছে।'

কিন্তু সে ভয়ঙ্কর।

'তুমি যেমনটা কল্পনা করেছ...'।

আমি এখন কি করব সেটা বল?

তৌফিক সাহেব নিজের সাথে কথা বলা বন্ধ করে ঠিক করলেন জিনিসটার দিকে না তাকিয়ে তিনি এগিয়ে যাবেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে যাবেন... যেমনটা প্রতিদিন যান। এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন মানে হয় না। তিনি এক পা এগুতেই জিনিসটি কথা বলে উঠল।

আমাকে দেখবে না? সুন্দর মেয়েলী একটা গলা । খুব পরিচিত গলা ! কে সে? তার স্ত্রী? ঠিক তো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন তিনি এবং একজন স্বাভাবিক মানুষের মতই ঘুরতে পারলেন ... কিন্তু তিনি জমে গেলেন।

তিনি এটা কি দেখছেন? তার পেছনটা শিরশির করে উঠল শীতল একটা বরফের স্রোত পা থেকে মাথা পর্যন্ত বয়ে গেল। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন... কিন্তু পারলেন না। হাঁটুর নিচে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই বলে মনে হল ...তিনি হাঁটু ভেঙে সামনের দিকে পড়ে যেতে থাকলেন... তিনি প্রাণপণে চিৎকার করার চেষ্টা করলেন... গলার কাছে কিছু একটা আটকে আছে বলে মনে হল...শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ...

ওদের ছয়জনের দলটা একটা ছিপ নৌকা নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে তুরাগ নদী ধরে এগিয়ে আসছে পিংকসিটির দিকে। এখানে নতুন আবাসন হয়েছে। সব ডুপলেক্স বাড়ি। বড়লোকরা সব এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। কেউ কেউ ভাড়াও দিয়েছে। এখানে ওদের দলের প্রথম অপরেশন। ঠোঁটকাটা সাদেক ভিতরে ভিতরে আজকের অপারেশনের ছক কাটে। সেই এই ডাকাত দলের দল নেতা।

এইখানেই নৌকা ভিড়াও। প্রায় ফিসফিস করে ঠোঁটকাটা সাদেক বলে।

আরেকটু সামনে নিয়া রাখলে ভাল হইত না ওস্তাদ

না এইখানে।

নৌকা ভিড়ল। সবাই নামল। সবার হাতে অস্ত্র, ভারি রাম দা, চায়নিজ কুড়াল। শুধু দল নেতা ঠোঁটকাটা সাদেকের হাতে একটা কাটা রাইফেল। আর বাম পকেটে আছে একটা পিস্তল। খুব প্রয়োজন না হলে সে এটা বের করে না।

এই, সবাই মুখে পট্টি বান।

ওস্তাদ, কোন বাড়িতে ঢুকমু?

যেইডা সামনে পড়ব ঐটাই।

তারা নিঃশব্দে হেঁটে এসে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। সব এক রকম বাড়ি। ছবির মত সুন্দর বাড়িগুলো। তাদের টার্গেট বাড়িটার নাম্বার ১৭/৮। বাড়ির মালিকের নাম লেখা আছে তৌফিক-এ- এলাহি।

'এই বাড়ি' ফিসফিস করে ঠোঁটকাটা সাদেক। তার উপরের ঠোঁটটা কাটা বলে কথা কখনো কখনো অস্পষ্ট।

শোন... লিডার ওদের কাছে ডাকে।

boighar.com

জি বলেন।

তোমরা বাড়ির পিছনে যাও আমি সদর দরজা খুলে ঢুকে পিছনের দরজা খুলে দিব।

কেন, সামনের দরজা দিয়া সবাই ঢুকলে সমস্যা কি?

যা বলছি কর।

সাদেক বিরক্ত হয়। ওরা কথা মত সরে গেল বাড়ির পিছনের দিকে। ঠোঁটকাটা সাদেক পকেট থেকে একটা বিশেষ ধরনের লম্বা সরু চাবির মত কিছু একটা বের করে সদর দরজায় লকে ঢুকায়। ডান দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে দু বার মোচড় দেয়, বাম দিকে একবার... নিখুঁত কাজ ! কট করে একটা ছোট্ট শব্দ হয়ে দরজাটা খুলে যায়। নিঃশব্দে ঢুকে ঠোঁটকাটা সাদেক। ড্রাইংরুমের আলো জ্বলছে। সাদেক আশ্চর্য হল একটা লোক সম্ভবত বাড়ির মালিকই হবে। উপুর হয়ে পড়ে আছে। ঘটনা কি? তার আগেই কোন দল ঢুকলো নাকি? সে চট করে কাটা রাইফেলটার ট্রিগারে হাত রাখে। চারিদিকে তাকায় সাদেক। ঘরের কোনায় চোখ আটকে যায় সাদেকের! এটা কি দেখছে সে? ভয়ঙ্কর সাহসী সাদেক দুই খুনের ফেরারী আসামী অজস্র ডাকাতি মামলার দাগী আসামী ঠোঁটকাটা সাদেক কুলকুল করে ঘামছে। তার হাতের তালু ঘামা রোগ আছে ...হাতে ধরা কাটা রাইফেলটা ধরে রাখতে পারছে না... মনে হচ্ছে পিছলে পড়ে যাবে। ছোটখাট ভয়ঙ্কর জিনিসটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। ঢোঁক গিলে সাদেক... কি করবে সে। কাটা রাইফেলটা উপরে তোলার চেষ্টা করে পারে না। মনে হচ্ছে এক মণ ওজন জিনিসটার, তারপরও আপ্রাণ চেষ্টা করে উঠাতে চেষ্টা করে...

কি হইল?

তাই তো! কি হইল?

আরেকজন সাগরেদ সায় দেয়।

ওস্তাদ, এখনও দরজা খুলতাছে না কেন?

ধরা খাইল নাকি?

শেষ বক্তার দিকে সবাই ঘুরে তাকাল! তাইতো এমনটা তো কখনো হয় না। তারা কাজ সারে দ্রুত। কিন্তু আজ কি হল?

‘ আমি একটু ভাব বুইঝা আসি– ’ বলে একজন বাড়ির সামনের দিকে যায়। পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে চার জন। তাদের হাতের চাইনিজ কুড়াল চাঁদের আলোয় চকচক করে ওঠে।

মিসেস তৌফিকের ডাকনাম মুননী। তৌফিক সাহেব আদর করে ডাকেন মুন। মুননী বিছানায় শুয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা বই পড়ছিলেন ‘পায়ের তলায় শর্ষে’। ভারতীয় বই; তবে বইয়ের প্রকাশনার মান দেখে বুঝা যাচ্ছে পাইরেট এডিশন... কিন্তু বইটা চমৎকার লাগছে পড়তে। ভ্রমণের বই মিসেস তৌফিকের এমনিই ভাল লাগে। বইটা বন্ধ করে উঠে বসলেন বিছানায়। অবাক কাণ্ড সেই কখন নিচে গেছে দরজা বন্ধ কিনা দেখতে, এখনো আসছে না কেন তৌফিক? একটু টেনশনও হল। লোকটার ব্লাডপ্রেসার আছে। যখন তখন হাঁই হয়ে যায়। পায়ে স্যান্ডেল ঢুকিয়ে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোলেন...মিসেস তৌফিক।

সিঁড়ির আধাআধি এসেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে নিচের পুরো ড্রইংরুমটা দেখা যায়। দেখেন তৌফিক উপুর হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে আর সদর দরজা খোলা। তিনি একটা চিল চিৎকার দিয়ে নিচে নেমে এলেন। চিৎকার শুনে কাজের লোক দুজনও ছুটে এল।

পরদিন একটা নামি-দামি ক্লিনিকে জ্ঞান ফিরল তৌফিক সাহেবের। ডাক্তাররা অবশ্য বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। কিছুদিন রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তাররা চলে গেলে মিসেস তৌফিক দরজা লক করে বসলেন বিছানায়।

কি হয়েছিল বলো তো? ভয় পেয়েছিলে?

হুঁম।

কি দেখেছিলে?

একটা অদ্ভুত প্রাণী...মানুষের মতই কিন্তু...

কিন্তু ?

কিন্তু মানুষ না।

কি করছিল ?

কিছুই করছিল না। আমার পিছেপিছে আসছিল...

তারপর ?

তারপর ভয় পেলাম ...আর মনে নেই।

boighar.com

কিন্তু দরজা খুলেছিলে কেন?

দরজা আমি খুলিনি। দরজা বন্ধই ছিল... হতে পারে ঐ প্রাণীটা দরজা খুলে চলে গেছে।

তাহলে প্রাণীটা ঢুকলো কিভাবে ?

ঢুকেনি। আগে থেকেই ঘরের ঐ ফাঁকা কোণটায় দাঁড়িয়ে ছিল।

পরদিন তারা বাসায় ফিরে গেলেন। স্বাভাবিক জীবন শুরু করলেন তারা। ঘরের ঐ ফাঁকা জায়গাটায় রাখা হল একটা সুন্দর জাপানী ডল। বেশ বড় পুতুলটা। ঘরেই ছিল, এখন বের করে সাজানো হল। ঘরের সিকিউরিটি আরো বাড়ানো হয়েছে। ড্রাইভারকে রাতে ড্রইংরুমে থাকতে দেয়া হয়েছে এখন থেকে। তৌফিক সাহেব আজকাল সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েন। মিসেস তৌফিক ফিরে গেছেন তার ভ্রমণ কাহিনীতে ...পায়ের তলে শর্ষে ...পাইরেট এডিসন বই

কিন্তু তারা সে রাতের পাইরেটদের কথা জানতে পারলেন না। সে রাতে যে আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল পাশাপাশি। একদল জলদস্যু এসেছিল তুরাগ নদী ধরে ছিপ নৌকায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল চায়নিজ কুড়াল। দল নেতার হাতে ছিল একটা কাটা রাইফেল...

... ... ছিপ নৌকাটা ফিরে যাচ্ছে । এই প্রথম ঠোঁট টা সাদেকের দল ডাকাতি না করে ফিরে যাচ্ছে। কাজটা অন্যদের পছন্দ না হলেও কিছু বলছে না। নৌকার গলুইয়ে সে চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে বসে আছে ঠোঁটকাটা সাদেক। সে খুবই চুপচাপ। কিছু একটা হয়েছে তার। কিন্তু কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

নির্দিষ্ট ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ল। সবাই নামল একে একে। সাদেক নামল না। বসেই রইল।

কি ওস্তাদ নামেন।

সাদেক কথা বলে না। হঠাৎ দমকা বাতাসে তার গায়ের চাদর আলগা হয়ে পালের মত ফুলে উড়ে গিয়ে নদীতে পড়ে। ওরা অবাক হয়ে দেখে সাদেক? ছোট্ট খাট্ট বামনের মত লোমশ একটা মানুষ বসে আছে । চোখ দুটো বড় বড় বের হয়ে আছে ...নাকটা ঝুলে আছে ঠোঁটের উপর। সেই ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি!

দ্বিতীয় পক্ষ

সবই ঠিক ছিল। বিশাল দোতলা বাড়ি আশেপাশে প্রচুর জায়গা। গাছপালাও আছে মন্দ না। শুধু নীচতলার কোনার ঘরটায় যাওয়া যাবে না মিনুর।

কেন যাওয়া যাবে না? মিনু প্রশ্ন না করে পারে না। মিনুর শান্ত শিষ্ট ভদ্র বর বেচারা যেন অস্বস্তিতে পড়ল।

সত্যি কথা বলতে কি এই ঘরে আমার দূর সম্পর্কের এক বোন থাকে আমিনা বুবু, তার মাথায় একটু গোলমাল আছে।

তাতে সমস্যা কি?

না মানে তুমি যদি ভয় পাও।

কি বলছ, তোমার বোনকে ভয় পাব কেন?

না মানে পাগলাতো...

না আমি এখনি যাব।

না না বাদ দাও ওদিকে চল।

বিয়ের পর মিনু তার বরের পৈতৃক বাড়িতে উঠে এসেছে। পুরোনো আমলের বাড়ি। এই বাড়িতে অবশ্য তারা থাকবে না এপার্টমেন্ট হচ্ছে। আর মাস ছয়েকের মধ্যে তারা এ বাড়ি ছেড়ে নতুন এপার্টমেন্টে উঠে যাবে।

তখন এ বাড়ির কি হবে? মিনু জানতে চায়।

এটাকেও ডেভেলপারকে দিয়ে দেওয়া হবে।

আর তোমার পাগল বোন? উনি কোথায় যাবেন?

ও...ওর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন।

এবার চল।

boighar.com

কোথায় ?

কেন তোমার পাগল বোনের রুমে

আহ বাদ দাও না...

আমি যাবই ।

মিনুর বর আবরারের পাগল বোন এর নাম আমিনা । তার রুমে ঢুকে খুব অবাক হল মিনু । ছিমছাম গোছানো একটা রুম । উঁচু খাটে বসে আছেন এক মহিলা রোগা পাতলা ফর্সা । কিন্তু চোখ জোড়া লাল টকটকে । মিনুকে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলেন, তারপর খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বললেন 'এস বউমা এস...আমার পাশে বস ।' মিনু এগিয়ে যাচ্ছিল । খপ করে তার হাত ধরে থামাল আবারার । ফিসফিস করে বলে ওর কাছে যেও না ।

এই আবরার ওকে আটকালি কেন?

এই সময় ঝনঝন শব্দ হল । মিনু অবাক হয়ে দেখল তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে । সেই শিকলের শব্দ ।

এই সময় একটা বাজে গন্ধ নাকে এল মিনুর কর্পুরের গন্দের মত । মিনু কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে একরকম জোর করে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে এল আবরার ।

এটা কি করলে?

না ওর কাছে থাকা যাবে না । তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না ।

এটা কেমন ভদ্রতা হল উনি কি ভাবলেন?

ও সব ভাবাভাবির উর্ধ্বে ... আসতো । আবরার একরকম জোড় করেই মিনুকে নিয়ে চলে এল দোতলায় নিজেদের ঘরে ।

সবার আপত্তির কারণেই আর মিনু নিচের কোনার ঘরটিতে আর গেল না । কি দরকার সংসারে অশান্তি এনে । এটুকু অন্তত বুঝছে তার শান্ত-শিষ্ট স্বামীটি এই একটা ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ।

বেশ চলছিল তাদের । হটাৎ বিকালে ফোন এল আবরারের ।

শোন একটু সমস্যা হয়েছে । ধ্বক করে উঠল মিনুর বুকটা ।

কি হয়েছে?

না মানে... হঠাৎ ব্যবসার কাজে আমাকে চিটাগং যেতে হচ্ছে রাতে ফিরতে পারব না । তুমি একা থাকতে পারবে তো?

boighar.com

কবে ফিরবে?

কাল বিকেলে। প্লেনে যাব প্লেনেই আসব। আমাদের বায়ারদের সঙ্গে জরুরী মিটিং।

ঠিক আছে সাবধানে থেকো। পৌঁছেই ফোন দিও কিন্তু।

একটা কথা...

কি?

বুঝতেই পারছ আমি কি বলতে চাচ্ছি।

বুঝেছি। আমি যেন নিচের কোনার ঘরে না যাই।

রাইট।

ঠিক আছে।

কথা দিলে?

উফ... দিলাম।

গুড গার্ল। ফোন কেটে দিল আবরার।

রাতে খেয়েদেয়ে বারটার দিকে একটা গল্পের বই নিয়ে বসল মিনু। বিয়ের পর আজই প্রথম রাত মিনুর আবরার ছাড়া একা একা। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই এই দোতলা বাড়ির প্রতিটা ঘরেই মানুষ আছে। তার পাশের ঘরেই রয়েছে দুজন বুয়া বেল টিপলেই ছুটে আসবে। সে রকমই ব্যবস্থা।

কতক্ষণ বই পড়ছিল। মনে নেই মিনুর হঠাৎ কি একটা শব্দে মুখ তুললো ... সঙ্গে সঙ্গে ধ্বক করে উঠল বুকটা শরীরের পিছন দিকটায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত শীতল একটা স্পর্শ ছুঁয়ে গেল...তার পায়ের কাছে বিছানায় বসে আছেন আবরারের পাগল বোন আমিনা!

কি বৌমা ভয় পেলে?

ন-না ... আপনি কিভাবে ঢুকলেন? কোনমতে ঢোঁক গিলে মিনু। সে টের পায় পাতলা কাঁথার নিচে তার হাত পা থরথর করে কাঁপছে।

তোমার দরজা খোলা... ঐ যে

আরে তাইতো, দরজাটা **ফাঁক** হয়ে আছে তবে কি দরজা না লাগিয়েই। কিন্তু পরের প্রশ্নই যেটা মাথায় এল শিকল? তার ভাবনাটাই যেন ধরে ফেলল আমিনা।

ছাপাখানার ভূত

''ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি' পেয়ে তারা তিনজনই এখন অবসরে। সেই কারণেই কিনা কে জানে তারা ভূত নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

'তার মানে, তুমি বলছ – ভূত বলে কিছু নেই?'

'না'।

'মামদো ভূত, স্কন্ধকাটা ভূত– এসব কিছুই নেই?'

'না' এগুলো বাচ্চাদের মন ভোলানো গল্প...আছে শুধু ২১-এর বইমেলার কিছু কিছু স্টলের বইয়ে...'

'তোমার যুক্তি মানতে পারলাম না। ভূত আছে.. তেরো রকম ভূত আছে।'

'হেহ্! বিষয়টা অনেকটা দুটো নারকেলকে পনেরোটা গ্রামে ভাগ করে দেয়ার মত হয়ে গেল না?'

'মানে?'

'মানে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটা নারকেল দিলি আর একটা দিলি নিজের গ্রামে।'

'উফ...আমরা ভূত নিয়ে আলোচনা করছি। এখানে আবার নারকেল...গ্রাম...ঢুকল কেন?'

'কিন্তু বারো ভূত তো মানুষ...ওই যে বলে না বারো ভূতে লুটেপুটে খায়...'

'হ্যাঁ ঠিক আছে। বারো ভূত আসলে মানুষ, তার মানে বাকি যেটা রইল সেটাই আসল ভূত।'

'কোনটা?'

'ছাপাখানার ভূত'।

'মন্দ বলিস নি। এই ভূতকে দেখা যায় না... তবে তার কর্মকাণ্ড দেখা যায়। অনেকটা 'দ্য এনটিটি' মুভির মত।'

boighar.com

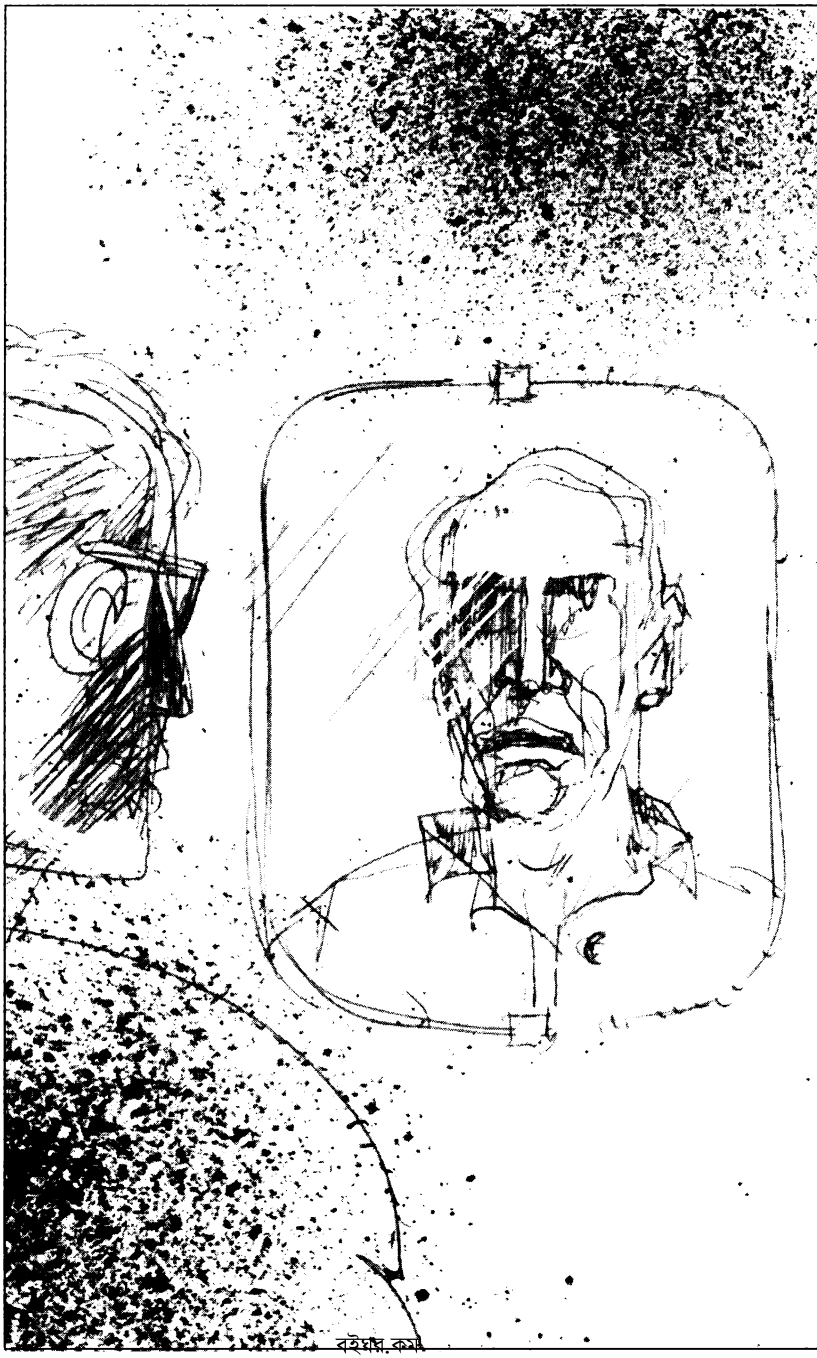

বইঘর.কম

'কোন মুভি?'

'দ্যা এ্যানটিটি। আমার দেখা একমাত্র ভয়ঙ্কর ভূতের ছবি। এতে কোনো ভূত নেই কিন্তু দেখলে তোর কলজে লড়ে যাবে। ছাপাখানার ভূতের সেই অবস্থা। এদের দেখা যায় না, তাদের কর্মকাণ্ড দেখা যায়। এবং এদের কর্মকাণ্ডে মাঝে মাঝে লেখক সম্পাদকের কলজে লড়ে যায়!'

'হুঁম্...মন্দ বলিস নি।'

'তার মানে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই। একটা ভূত আছে – এই ছাপাখানার ভূত!'

'ঠিক তাই।'

'এই ভূত থাকে কোথায়?'

'কেন? প্রেসে!'

'এই ভূতের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী?'

'এই ভূতের ওঝা হচ্ছে সিরিয়াসলি একজন ভাল প্রুফ রিডার...।'

'আমার কি মনে হয় জানিস?'

'কী?'

'প্রুফ রিডার মারা গেলেই হয় ছাপাখানার ভূত।'

'ধুৎ কী সব বলিস উল্টা-পাল্টা!'

বলাই বাহুল্য 'ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি' পেয়ে অবসরে যাওয়া তিন সরকারি কর্মকর্তা কিন্তু ভূত নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল একটা প্রেসে বসেই। প্রেসটা তাদের আরেক বন্ধু অমলের। বন্ধু অনুপস্থিত বলে তারা বসে আড্ডা দিচ্ছিল।

'নাহ্ চল, অমল মনে হয় আর এ বেলায় আসবে না।'

'তাই মনে হচ্ছে। ফোনও এনগেজড পাচ্ছি। চল....'

তারা বেরিয়ে এল। তারা বেরিয়ে যেতেই একটা আবছা মূর্তি বেরিয়ে এল। মূর্তিটার হাতটা প্রতিটা খোলা কম্পিউটারের কি-বোর্ড আলগোছে একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল...!

boighar.com

সঙ্গী

ভূতের কাজ হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো।

'ব্যাস এই?'

'তো এছাড়া আর কী?'

'আরে না, আমার মনে হয় ভূতের আরও কিছু কাজ আছে...আই মিন, থাকা উচিত।'

'কেন? এ কথা বলছিস কেন?'

'প্রকৃতিতে কারণ ছাড়া কিছু নেই। ভয় দেখানো কোনো কারণ হতে পারে না। ভূতের নিশ্চয়ই অন্য কোনো কাজ আছে, তারা অন্য কিছু করে।'

'কী করে?'

'সেটাই তো ভাবছি।'

'তুই তা হলে ভাবতে থাক। আমি চলি।' মজিদ উঠে পড়ে।

'চলি মানে? আমি একা থাকব নাকি? পরে ভূত এসে আমার ঘাড় মটকাবে।'

'মটকাক, তোর ঘারের উপর ওই মাথাটার আদৌ কোনো দরকার নেই।'

মজিদ সত্যি সত্যি চলে যায়। সেলিম ঝিম মেরে বসে থাকে। তার একটু নেশা হয়েছে। সে সাধারণত পান করে না, আজ মজিদের পাল্লায় পড়ে একটু ব্রান্ডি খেয়েছে। তাতেই মনে হচ্ছে...ঘাড়ের উপর মাথাটার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তার।

তারা কয়েকজন মালদার বন্ধু মিলে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে স্রেফ আড্ডা মারার জন্য। একেক দিন একেক বিষয় নিয়ে আড্ডা হয়।

bolghar.com

আজ অবশ্য ধরা... কেউ আসে নি। মজিদও চলে গেল। মজিদ গ্লাসে আরেকটু ব্রাণ্ডি ঢালে... শালার বাচ্চা মজিদ বোতলটাও নিয়ে যায় নি। নিয়ে গেলে হয়তো আর খাওয়া হত না।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হলো। সেলিম তাকিয়ে দেখে সামনে মজিদ দাঁড়িয়ে আছে!

'কীরে আবার ফিরে এলি যে?' মজিদ কথা বলছে না। মজিদকে খুব লম্বা লাগছে। আর ঝাঁপসা দেখাচ্ছে। তার মানে ব্রাণ্ডি বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।

'কীর মজিদ কথা বলছিস না যে?'

'আমি মজিদ না।'

'তা হলে কে? মজিদের ভূত?'

'বলতে পারিস।'

সেলিম তাকিয়ে দেখে তার সামনে মজিদ দাঁড়িয়ে আছে, ফ্লোর থেকে ঠিক এক ফুট উপরে...একটু একটু দুলছে!

'কী উল্টাপাল্টা বলছিস? খেলাম আমি আর মাতলামি করছিস তুই?'

'ঠিকই বলছি, একটু আগেও মজিদ ছিলাম, এখন মজিদের ভূত।'

সেলিমের নেশা মনে হয় সত্যি সত্যি কেটে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সত্যি সত্যি দরজার কাছে মজিদ মাটি থেকে উঠে এক ফুট উপরে দাঁড়িয়ে...একটু একটু দুলছে। এ জন্যেই তাকে একটু বেশি লম্বা লাগছিল।

'তুই তা হলে সত্যি মজিদের ভূত?'

'হ্যাঁ...এখান থেকে বের হয়ে গাড়ি ঘুরাতে গেলাম, তখন হঠাৎ ১টা পাঁচ টনি লোডেড ট্রাক মেরে দিল, একদম স্পট ডেড! প্রচণ্ড শব্দ হয়েছিল। টের পাসনি?'

'না তো।'

'বিকট শব্দ হয়েছে। আমার গাড়িটা দুমড়ে মুচড়ে পিশে গেছে রাস্তার সঙ্গে। শক-ওয়েভে এই ফ্ল্যাটের সবগুলো জানালা কাঁপল। আমি টের পেয়েছি...তখনই তো মারা গেলাম।'

'তারপরই তুই ভূত হয়ে গেলি?'

হুঁম্...ভয় পাচ্ছিস?'

'না।'

'তোর কথাই ঠিক রে।'

'কোন কথা?'

'ওই যে বললি না ভূতদের অন্য কোনো কাজ আছে বা থাকে...ভয় দেখানো ছাড়া। ভয় দেখানো আসলে কোনো কাজ না!'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে...তা কাজটা কী?'

'ভূতরা আসলে খুব ভীতু রে।'

'মানে?'

'তারা যখন তাদের আশ্রয় হারায়, মানে শরীরটা হারায় তখন তাদের জগতে একা একা ফিরে যেতে ভয় পায়।'

'তাদের জগত মানে?'

'তাদের...মানে আমাদের আলাদা একটা জগত আছে না? সেখানে ফিরে যেতে হয়...'

'আচ্ছা।'

'আমাকেও যেতে হবে।'

'তা যাচ্ছিস না কেন? যা...'

'কিন্তু ওই যে একা একা যেতে ভয় পাচ্ছি...তুই চল না...এটাই ভূতদের কাজ, সঙ্গী খুঁজতে আসে!'

সেলিম বুঝতে পারে সে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছে। নেশাটা কাটে নি। তাই এসব উল্টাপাল্টা দেখছে! সে পাশের বেসিনে মাথাটা ধুয়ে ফিরে তাকায় দরজার দিকে। না এখন আর ভূত মজিদ দাঁড়িয়ে নেই... জায়গাটা ফাঁকা!

সেলিম ফ্ল্যাটের দরজা লক করে লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। এটা ষোল তলা, টপ ফ্লোর। লিফট সাত-এ আটকে আছে। বাটন টিপল সেলিম। লিফট রওনা দিয়েছে আট-এ এল... তারপর... নয়... দশ... এগারো... ... ...ষোলো! লিফটের দরজা খুলে গেল। পা বাড়াল সেলিম। পা ঠিক লিফটের মেঝেতে পড়ল না। লিফট আসে নি... শুধু দরজাটা খুলেছে...তলিয়ে গেল সেলিম...লিফটের অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে...নিচে, অনেক নিচে...সে খেয়াল করল না বা খেয়াল করার কথাও না...অনেক নিচে উপরের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছে মজিদ...ভূত মজিদ... তার সঙ্গীর অপেক্ষায়!

boighar.com

পূর্ণ ভূত

সঞ্জুর খুব সাহস। কোনো ভয়-ডর নেই। নানার বাড়িতে বেড়াতে গেলে যখন তার নানু কলজে-কাঁপানো সব ভূতের গল্প বলে, তখন সবাই ভয় পেলেও সঞ্জু দাঁত বের করে হি হি করে হাসে! যেন এটা একটা হাসির গল্প। অন্যরা তখন তাকে ধমক লাগায়–

'এই ফাজিল, হাসছিস কেন? চুপ!'

সঞ্জুর হাসি থামে না। হি হি করে হাসতেই থাকে। এ জন্য ওকে আর ভূতের গল্পের আসরে ডাকা হয় না।

সঞ্জু ক্লাস সেভেন থেকে এবার এইটে উঠেছে! তার খুব শখ ভূত দেখার। কিন্তু সঞ্জুকে দেখা দেয় না। অন্তত সঞ্জুর তাই ধারণা।

'বাবা, আমি ভূত দেখতে চাই।'একদিন সাহস করে বাবাকে বলেই ফেলে। বাবা পেপার পড়ছিলেন। ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকালেন সঞ্জুর দিকে।

'কী বললি?'

'ভূত দেখতে চাই।'

'ভূত বলে কিছু নেই। দেখবি কোত্থেকে?'

'তবে যে এত ভূতের গল্পের বই?'

'সব মিথ্যা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, এই মিথ্যাটা অন্তত সত্যি।' বাবা পেপারে মনোযোগ দেন।

সঞ্জু এবার মাকে গিয়ে ধরে। মা সঞ্জুর বড় বোনের জন্য নাস্তা তৈরি করছিলেন। বড় বোন মিলু কলেজ থেকে এসেই নাস্তার জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, তাই অগ্রিম প্রস্তুতি মায়ের।

'মা?'

'কী?'

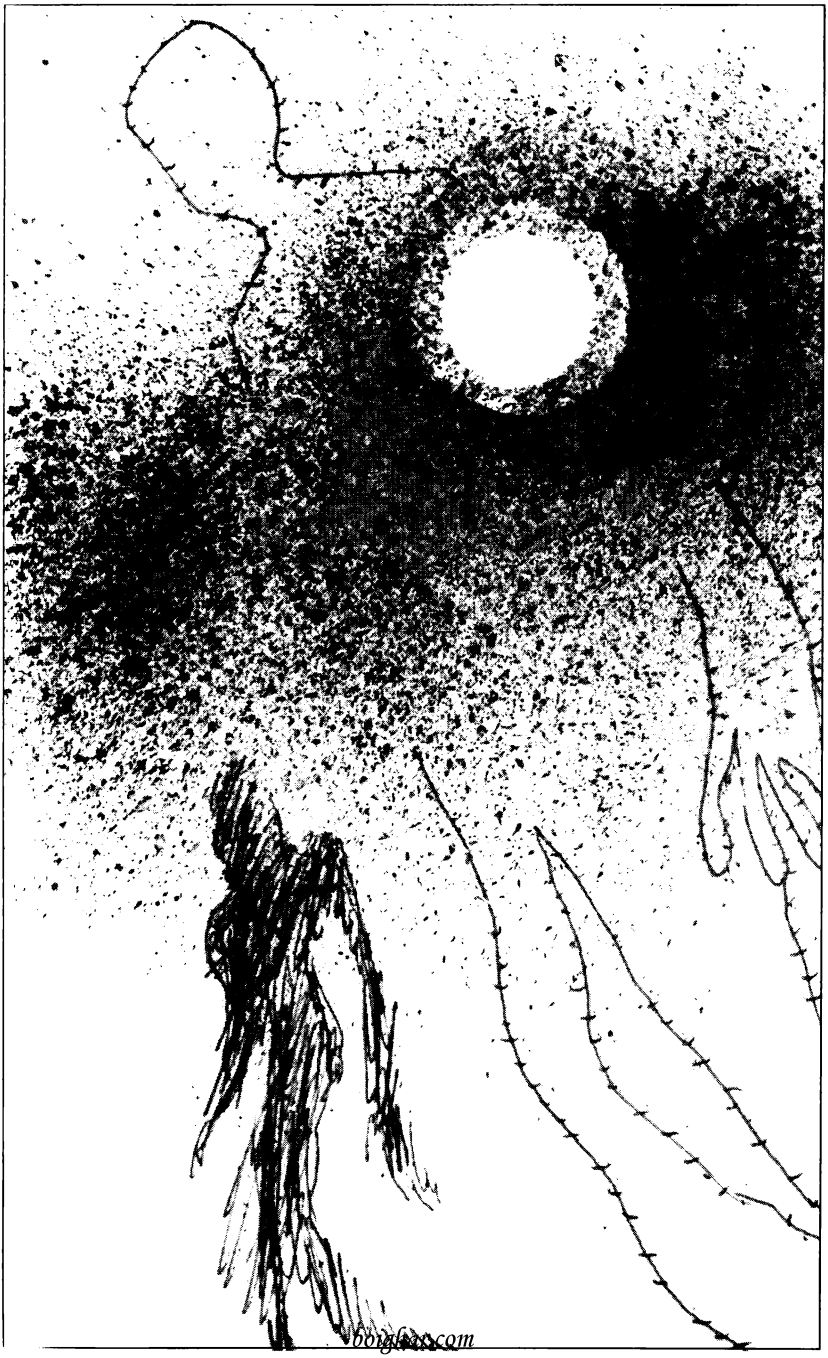

boighar.com

'একটা কথা বলব।'

'আবার কী কথা?'

'আমি ভূত দেখতে চাই।'

'কী?'

'ভূত দেখতে চাই।'

'ফাজলামো করিস না। যা ভাগ...'

'না, মা। সত্যি আমার খুব শখ একটা ভূত দেখি।'

বুয়া মশলা বাটছিল। সে মশলা বাটা বন্ধ করে সঞ্জুর দিকে তাকায়। গম্ভীর হয়ে বলে–

'সত্যি ভূত দেখবা?'

'হুঁম্।'

'তাইলে ওই রাস্তার মোড়ে তেঁতুল গাছের নিচে খাড়াইও। ওখানে একটা ভূত আছে। আমি একদিন দেখছি।'

'সত্যি দেখছ?'

'তিন সত্যি।'

'উফ্ কমলার মা, বাজে বোকো না তো। কাজ করো।' মা ধমক লাগায় বুয়াকে। 'সঞ্জু যা তো এখান থেকে...কাজের সময় যত ঝামেলা করতে আসে।' তিনি সঞ্জুকে নিয়ে একটু চিন্তিত বোধ করেন। ছেলেটা, তিনি যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে বড় হচ্ছে না!

সন্ধ্যার সময় সত্যি সত্যি রাস্তার মোড়ের তেঁতুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল সঞ্জু। সত্যিই কি এই গাছে ভূত আছে? তাদের বাসা থেকে এই গাছটার দূরত্ব খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজের মত হবে। অন্ধকার হয়ে আসছে বলে গাছের সবুজ ভাবটা বোঝা যাচ্ছে না, কালচে মেরে আছে। এই এলাকায় মানুষ এমনিই

কম। এখন সন্ধ্যা বলে আশেপাশে কেউ নেই। সঞ্জু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় গাছটার দিকে...কই ভূত?

'কী খোঁজো?' হঠাৎ প্রশ্নে চমকে পেছনে তাকাল সঞ্জু। তার পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাথা কামানো, হাসি হাসি মুখ, রোগা ফর্সা...

'ভূত।' সঞ্জু একটুও না ঘাবড়ে বলে।

'ভূত?'

'জি।'

'তুমি ভূত খুঁজছো এই গাছে?'

'জি।'

'তোমাকে কে বলেছে এই গাছে ভূত থাকে?'

'কমলার মা , আমাদের বাসার বুয়া।'

'হুঁম্...তবে পুরোপুরি ঠিক বলে নাই।'

'কী রকম?'

'এই যেমন ধরো, এই গাছে ভূত থাকে... কথাটা পুরাপুরি সত্যি নয়।'

'কেন?'

'থাকে...তবে পুরো ভূত থাকে না। আধাআধি ভূত থাকে। মানে বলতে পার অর্ধ ভূত।'

'সেটা আবার কী রকম?'

'শোনো ছেলে, আজকাল ভূত হওয়া এত সোজা না। সাধনার ব্যাপার। প্রথমে বটগাছে এক বছর, তারপর তেঁতুল গাছে দুই বছর, তারপর ফাইনালি শ্যাওড়া গাছে তিন বছর, মোট ছয় বছরের কোর্স...তারপর একজন পূর্ণ হতে পারে... তার আগে সব অর্ধ ভূত...'

'বলেন কী? আপনি এত কিছু জানেন কীভাবে?'

'জানব না, আমিও তো সেই রকম একজন।'

'মানে?'

'মানে আমি একজন অর্ধভূত।'

'সত্যি?'

'বিশ্বাস না হলে আমার গায়ে হাত দাও...'

সঞ্জু হাত দিল! কী আশ্চর্য তার ডান হাতটা লোকটার শরীরের ভেতর দিব্যি ঢুকে গেল। এর মানে কী? এই প্রথম সাহসী সঞ্জুর গাটা ছম ছম করে উঠল!

'তা–তার মানে আ-আপনি ভূ-ভূত? অর্ধ ভূত?'

'হ্যাঁ...ডরাইছ?'

'ন্‌না...'

'ঠিক আছে যাই, তুমি সাহসী ছেলে...সেইদিন এক জনরে দেখা দিলাম। সে তো কাপড় নষ্ট করে ফেলল!'

boighar.com

'হি হি।'

'হাসলা যে?'

'না, ওই যে কাপড় নষ্ট করার কথা বললেন।'

'খবরদার হাসবা না। ভূতের সামনে ভয় না পাও, হাসবা না।'

'কেন?'

'কারণ অন্য ভূতরা দেখলে বিরাট লজ্জার ব্যাপার। আবার বটগাছে এক বছর নতুন করে শুরু করতে হবে। আমি বটগাছ শেষ করে তেঁতুল গাছে আছি দেড় বছর হয়ে গেছে। আগামী বছর ইনশাল্লাহ্ শ্যাওড়া গাছে...যাই...'

বলেই লোকটা মানে অর্ধ-ভূতটা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিব্যি মানুষের মত হেঁটে উঠে গেল গাছের খাড়া কাণ্ড ধরে তরতর করে। হা করে দাঁড়িয়ে রইল সঞ্জু। কী মনে হলো, সঞ্জু চেঁচিয়েউঠল–

'কাল আসলে কি আপনার দেখা পাব?'

'কেন?'

'কালও যদি আপনাকে দেখি, তা হলে দুই অর্ধ-ভূত মিলে একটা পুরা ভূত হয়ে যেত।'

'না, কাল আসব না।' গাছের সবুজ অন্ধকারে ঝাঁকড়া পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল অর্ধ-ভূতটা!'

এই ঘটনার বেশ ক'বছর পর সঞ্জু গেল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পিকনিকে রাজেন্দ্রপুরে। সারাদিন বেশ মজা হলো। বিকেলের দিকে সবাই একটা গাছের নিচে বসে ছিল। হঠাৎ তাদের দলের একটা মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'এই, জলদি ওঠ সবাই।'

'কেন ?'

'আরে এটা শ্যাওড়া গাছ।'

'তাতে কী ?'

'বাহ্ শ্যাওড়া গাছে ভূত থাকে না? তা ছাড়া সন্ধ্যা হয়ে আসছে...এখনইভূতরা এই গাছ থেকে নেমে আসবে।'

দু-একজন তার কথা শুনে হেসে উঠলেও সবাই কিন্তু উঠে পড়ল।

ওদিকে বাসও হর্ন দিচ্ছিল। অর্থাৎ পিকনিক পার্টির এখন ফিরে যাওয়ার পালা।

সঞ্জু একাই বসে রইল। তার হঠাৎ মনে পড়ল সেই অর্ধ ভূতের কথা। এই গাছটাই তো তার কোর্স কমপ্লিট করার শেষ গাছ। মানে শ্যাওড়া গাছ। এই গাছ থেকেই সে পূর্ণ ভূত হবে। সঞ্জু দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকায়...

'এই সঞ্জু এখনও বসে আছিস? জলদি আয়। সবাই বাসে উঠে পড়েছে!'

সঞ্জু তাকিয়ে দেখে জুয়েল। বাস হর্ন দিচ্ছে...সঞ্জু জুয়েলের পেছন পেছন ছুটল বাসের দিকে। বাস তখন স্টার্ট দিয়ে এগুতে শুরু করেছে! সঞ্জু লাফিয়ে বাসে ওঠে। পূর্ণ ভূত আর দেখা হলো না।

বাসে বেশ মজাই হলো। সবাই যার যার মত বেসুরা গলায় গান গাইতে গাইতে ফিরল।

বাস থেকে নেমে সঞ্জু জুয়েলকে দেখল না।

'এই জুয়েল কইরে?'

'জুয়েল? সে তো পিকনিকে আসে নি!'

'কী বলিস?'

'ঠিকই বলছি!'

কী মনে হলো সঞ্জু ছুটে গেল জুয়েলদের বাসায়। একি বাসার সামনে এত লোকজনের ভীড় কেন? সবাই বিষন্ন। কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদছে! একটু পরেই জানা গেল জুয়েল আজ সকালেই রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। যখন ওরা বাসে আনন্দ করছিল তখন তাদের প্রাণের বন্ধু জুয়েল...আর ভাবতে পারে না সঞ্জু। তার পা দুটি যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

boighar.com

দেয়ালের মানুষ

'স্যার, লোকটা আমার ঘরে প্রায়ই আসে।'

'তাই?'

'জ্বি। আইসা ঘরের কোনাই খারাইয়া থাকে।'

'হুঁম্।'

'খাড়াইয়া থাকে আর আমার দিকে চাইয়া থাকে।'

'ব্যাস এই?'

'জ্বি।'

'দেখতে কেমন?'

'মাথায় চুল কম, কালো, রোগা, লাম্পা...'

'কত লম্বা?'

'অনেক লাম্পা।'

'ছয় ফিট?'

'না আরও...ঘরের ছাদে মাথা ঠেকে।'

'হুঁম্।'

ড. কিবরিয়া এবার লোকটির দিকে ভাল করে তাকালেন। নিরীহ লোকটি তার বাসার নতুন দারোয়ান। আসলে তার বাসার দারোয়ান লাগে না। তারপরও একজন রাখা হয়েছে। এর পেছনে অবশ্য একটা গল্প আছে।

এই তো মাস খানেক আগে মিনি ধানমণ্ডিতে গাড়ি পার্ক করে কিছু ফলমূল কিনলেন। পরিমাণটা একটু বেশিই ছিল। দু'প্যাকেট ফল তিনি হাতে করে নিয়ে গাড়ির দিকে আসছিলেন, হঠাৎ একটা প্যাকেট ছিঁড়ে

ighar.com

হড়বড় করে সব আপেল পড়ে গেল। বিব্রতকর পরিস্থিতি। এ সময় এই লোকটি কোত্থেকে ছুটে এসে সবগুলো আপেল কুঁড়িয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিল। কিবরিয়া সাহেব এই অবাঞ্ছিত সাহায্যের জন্য খুশি হয়ে তার দিকে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। লোকটি নিল না।

'কি হলো? নাও!'

'না স্যার, ট্যাকা লাগব না। একটাচাকরি দেন।'

ড. কিবরিয়া তার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন। চাকরি যেন পঞ্চাশ টাকার নোট, ম্যানিব্যাগে থাকে। মানিব্যাগ থেকে যখন তখন বের করে দেয়া যায়।

'স্যার, বেতন লাগব না। পেডেভাতে থাকতে দিলেই হইব।'

'ঠিক আছে। গাড়িতে ওঠো।'

লোকটি খুব ব্যস্ত হয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

তারপর থেকেই সে তার বাসার দারোয়ান। বেতন ১৫০০ টাকা। যদিও সে বলেছে বেতন লাগবে না। তার তিন কুলে কেউ নেই...শুধু থাকা আর খাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলেই...ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলাদেশের ভাসমান মানুষদের সেই চিরন্তন গল্প।

'তোমার তিন কুলে কেউ নেই কিন্তু এই লোক তো দেখছি তোমাকে ছাড়ছে না। প্রতিদিন আসে।'

'জ্বি প্রতিদিন আসে।'

'আচ্ছা লোকটা কীভাবে ঢোকে তোমার ঘরে?'

'প্রথমে দেয়াল ছেদা কইরা হাতটা ঢুকায়, তারপর ডান পাওডা, তারপর পুরা শরীলডা।'

'দেয়ালের ভেতর দিয়ে?'

'জ্বি স্যার।'

'ইন্টারেস্টিং।'

'স্যার, দেয়ালে কোনো ক্ষেতি হয় না। আমি হাত দিয়া দেখছি। রং চংও উঠে না।'

'কতক্ষণ থাকে?'

'যতক্ষণ আমি জাগনা থাকি ততক্ষণ...'

'আচ্ছা।'

ড. কিবরিয়া তার লেখায় মনোযোগ দেন। লিখতে লিখতে শোনেন। এতে তার লেখার অসুবিধা হয় না। লোকটা সম্ভবত সিভিয়ার সিজোফ্রেনিয়া রোগী, সিমটম সেরকম...হয়তো তার হ্যালুসিনেশন হয়।

'তুমি নেশা করো?'

'না স্যার...'

'গুড, আচ্ছা এখন যাও। আমার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসো।'

'জ্বি স্যার।'

লোকটা দারোয়ান হিসেবে সুবিধার না। তবে ভাল লাল চা বানায়। তার তৈরি আদা চায়ে কেমন একটা অন্যরকম ফ্লেভার চলে আসে। তরুণ বয়সে নাকি রেস্টুরেন্টে কাজ করত। ওখানেই শিখছে এই রকম চা বানানো।'

'তুমি চায়ে কী দাও?' একদিন তিনি জিজ্ঞেসই করেছিলেন।

'ক্যান স্যার? আদা দেই, চা পাতি দেই, চিনি দেই।'

'আর কী দাও?'

'লবণ দেই।'

'লবণ দাও?'

'জ্বি স্যার।'

'কেন?'

'লবণ না দিলে আদা চা জমে না।'

'আচ্ছা।'

'স্যার এই যেচা।' চা নিয়ে এসেছে মকবুল।

'মকবুল?'

'জ্বি স্যার।'

'তোমার ঘরে যে লোকটা আসে, সব সময় তার মাথা ছাদে ঠেকে?'

'না স্যার, মাঝে মাঝে আমার সাইজেও আসে।'

'আচ্ছা।'

'লোকটা যখন আসে তখন কোনো শব্দ হয় না?'

'হয় স্যার।'

'কি রকম শব্দ হয়?'

'কাপড় ছেঁড়ার শব্দ...পড় পড় একটা শব্দ।'

boighar.com

'হুঁম্! আচ্ছা তুমি যাও।'

রাত দেড়টা বাজে। ড. কিবরিয়া তার ল্যাপটপে টাইপ করছেন। লেখাটা আজ শেষ করতে হবে। অনেক দিন ধরে ঘটর ঘটর করছেন তিনি লেখাটা নিয়ে। এগুচ্ছে না। আজ মনে হচ্ছে এগুবে। শেষ হলে আজই মেল করে দেবেন।

এই সময় শব্দটা হলো। কাপড় ছেঁড়ার পড় পড় একটা শব্দ। যেন কেউ আস্তে আস্তে পুরোনো একটা কাপড় টেনে টেনে ছিঁড়ছে। ড. কিবরিয়া চোখ তুলে তাকালেন। তার সামনের ফাঁকা দেয়ালটা দিয়ে একটা কিছু বেরিয়ে আসছে... মানুষের হাত? ড. কিবরিয়া চোখ বন্ধ করলেন।

'নিশ্চয়ই আমি ভুল দেখছি! রাত জাগার কারণে আমার বিভ্রম হচ্ছে!'

পড় পড় কাপড় ছেঁড়ার শব্দটা আর নেই। ড. কিবরিয়া চোখ খুললেন। ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান মকবুল। ঘরের অন্য সব দরজা জানালা বন্ধ।

'স্যার, উনি আজকে আসেন নাই। তাই আমিই আসলাম।'

এই শীতের রাতেও ড. কিবরিয়া কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

কবর

কবরস্থানে রাতে গার্ড দেয়া হয়েছে। তাও একজন না, দুজন। একজন যদি ভয় পায় তাই দুজনের চাকরি একসাথে। কাজ কিছুই না, শুধু রাতে কবরস্থানে টহল দেয়া। কারণ ক'দিন ধরে কবর থেকে কাফনের কাপড় চুরির ঘটনা ঘটছে। নতুন কবরগুলোতেই সাধারণত ঘটছে ব্যাপারটা। নতুন কবরে চিকন বাঁশ বা কিছু ঢুকিয়ে কী এক অদ্ভুত কায়দায় কাফনের কাপড় টেনে নিচ্ছে। কী করে এরা কাফনের কাপড় টেনে নিচ্ছে। কী করে এরা কাফনের কাপড় দিয়ে? বিক্রি করে? নাকি অন্য কিছু আছে কে জানে। মানুষ আর কত নিচে নামবে? হাঁড়-হাড্ডি চুরির বিষয় তো আছেই। কংকালের পুরো সেট নাকি আন্তর্জাতিক বাজারে ৬,০০০ ডলার। বিদেশে বিরাট চাহিদা। সবাই বলে খাঁচার ব্যবসা। ভারত থেকে এসেছে এই ব্যবসা। মানুষের খাঁচা বিক্রি হয়। মরার পরে, কখনও কখনও মরার আগেই।

'ওস্তাদ, এদিকে আসেন।'

অপেক্ষাকৃত তরুণ গার্ড নজরুল ডাকে। বয়স্কজন এগিয়ে আসে। তার হাতে একটা পাঁচব্যাটারির টর্চ। আর লাঠি।

'কী হইল?'

'এই কবরটা দেখছেন?'

'কী মিয়া, তোমারে না কইছি আঙ্গুল দিয়া কবর দেখাইবা না? আঙ্গুলে কামড় দেও জলদি।'

'ক্যান ওস্তাদ?'

'এইডাই নিয়ম।'গম্ভীর হয়ে বলে বয়স্ক গার্ড আব্দুল বাতেন।

তরুণ গার্ড নজরুলকিঞ্চিত ভীত হয়ে আঙ্গুলে কামড় দেয়।

'এহন কও এই কবরে কী হইছে?'

boighar.com

বইঘর.কম

'কিছু হয় নাই, কইতাছি একদম নতুন কবর এইটা।'

'কার কবর?'

'একজন মেয়েছেলের কবর। সুইসাইড খাইছিল।'

'কেমনে বুঝলা?'

'এই যে কাগজে লেইখা রাখছে।'

'সুইসাইড খাইছিল এইডাও লেখছে নাকি?'

'না না লেখছে...'

'হুঁম্।'

উদাস হয়ে যায় আব্দুল বাতেন। আকাশের দিকে তাকায়। আধখানা চাঁদ তার পুরো আলো ঢেলে দিয়েছে এই কবরস্থানে। চাঁদের আলো গাছের পাতার ফাঁক গলিয়ে কবরস্থানের স্থির কবরগুলোতে অদ্ভুত সব নকশা করেছে।

'বুঝলা মিয়া এই যে বেড়াডা দেখতাছ?'

'কোন বেড়া?'

'আরে এই যে কবরটার চাইর দিকে নতুন বেড়াডা।'

'হ হ বুঝলাম।'

'এর বাইরে যারা আছি... মানে আমি তুমি.. ভাই বেরাদার...'

'জ্বি'।

'তারা এই বেড়ার ভিতরে ঢুকতে চাই না। ঠিক কিনা?'

'জ্বি ঠিক।'

'আর যারা বেড়ার ভিতরে আছেতারা বাইরে আইতে চায় না।'

'বাঃ বাঃ কী সুন্দর কথা কইলেন!'

'এইডা আমার কথা নারে ভাই... বড় অলি-আওলাদের কথা। লও পুরাডা একটা চক্কর দিই।'

'লন।'

তারা হাঁটতে থাকে। তাদের রাবারের জুতার সোলের কারণে কিনা কে জানে হাঁটার কোনো শব্দ হয় না। মৃদু-মন্দ বাতাসে গাছের পাতাগুলো থির

থির করে কাঁপে। এখানে প্রচুর গাছ, ছোট-বড় নানা কিসিমের। আব্দুল বাতেন বিড়ি ধরায়।

boighar.com

'খাইবা নাকি একটা?'

'জ্বি না। আপনি খান।'

'ভাল ভাল। না খাওয়াই ভাল... বাজে নেশা।'

তারা এগিয়ে যায় বিড়ির গন্ধ ছড়িয়ে। পুরা একটা চক্কর তখনও দেয়া শেষ হয় নি। হঠাৎ ওস্তাদ দাঁড়িয়ে গেল। নজরুল খেয়াল করল তার হাত থেকে বিড়িটা মাটিতে পড়ে গেল। মুখে বলল, 'কী হইল ওস্তাদ' তার আগেই ওস্তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে বুকটা হিম হয়ে গেল নজরুলের!

ঠিক তাদের ডান পাশের একটা কবরের উপর একটা মেয়ে বসে আছে হাসি মুখে।

'ওস্তাদ এইডা কী?' ফিস ফিস করে বলে নজরুল।

'তুমিও দেখছ... মাবুদে এলাহি...' বিড় বিড় করে আয়াতুল কুরসি পড়ে আব্দুল বাতেন।

হঠাৎ কী মনে করে নজরুল আব্দুল বাতেনের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে আলো মারে মেয়েটির উপর। পাঁচ ব্যাটারির হঠাৎ তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় দুজনের...মেয়েটিকে আর দেখা যায় না। এবার দুজনেই এগিয়ে যায় কবরটার কাছে। কই? কেউ কোথাও নেই। একটা কবর...শূন্য কবর। মাটি খোঁড়া, যেন কেউ একটু আগে খুঁড়েছে। ভিতরটা ফাঁকা।

'ওস্তাদ, এই কবরটা কি ফাঁকা আছিল?'

'না তো!' তারা বোকা হয়ে যায়। কবরস্থানে কোনো ফাঁকা কবর ছিল না। এটা কোত্থেকে এল হঠাৎ করে?

এই সময় কবরস্থানের গেটের কাছে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ ক'জন মানুষের পায়ের আওয়াজ। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে খাটিয়ায় করে লাশ নিয়ে ঢুকছে চারজন লোক। সাথে আরও ক'জন লোক। ওরা এগিয়ে গেল। এত রাতে লাশ নিয়ে কারা এল! রাতে গোর দেওয়ার নিয়ম নেই। আরে তাদের এলাকার একজন প্রভাবশালী মুরুব্বি মোতাব্বের সাহেবকে দেখা গেল। যিনি তাদেরকে চাকরি দিয়েছেন এই কবরস্থানে।

বইঘর.কম

'কার লাশ স্যার? এত রাতে?' আব্দুল বাতেন এগিয়ে যায়। মুরুব্বি মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করার ভঙ্গি করেন।

বহিরাগতরা খুব তাড়াহুড়ো করে লাশটাকে নামাল সেই শূন্য কবরে। লাশটাকে এক পলক দেখল তারা দুজনই। সেই মেয়েটি, যাকে একটু আগে শূন্য কবরের উপরে বসে হাসতে দেখেছে দুজনই।

সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত হলো যে, ওরা বুঝে উঠার সময়টা পর্যন্ত পেল না। দ্রুততম সময়ে তারা মেয়েটিকে কবর দিয়ে চয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে বসে রইল গার্ড দু'জন।

সকালে দুই গার্ড যখন ডিউটি শেষ করে বেরুচ্ছে, তখন দেখল সেই রাতের দলটি আবার এল। সেই লাশ বহনকারী চারজন। সাথে বেশ ক'জন এবং প্রভাবশালী মুরুব্বি মোতাব্বের সাহেব। রাতে কাঁদতে দেখা যায় নি। কিন্তু এখন মোতাব্বের সাহেব কাঁদতে কাঁদতে ঢুকলেন। তার মেয়ে মারা গেছে। গত রাতে। তাকে কবর দিতে এসেছেন তিনি। সেই জায়গাটায় কবর খোঁড়া শুরু হলো। কিন্তু রাতে তারা দেখেছিল শূন্য খোঁড়া কবর! নজরুল আর আব্দুল বাতেন দু'জন দু'জনের দিকে তাকায় অবাক ভঙ্গিতে।

boighar.com

ছেমা আসতাছে

'এই ছেলে, তোমার নাম কী?'

'রফিক।'

'খালি রফিক?'

'রফিক।'

'আগে পিছে কিছু নাই? খালি রফিক?'

'কিছু নাই,..রফিক।'

'তোমার বয়স কত?'

'তেরো।'

'আনলাকি থার্টিন...।' পাশ থেকে ফিসফিস করে রবীন। রবীনদের গ্রামের বাড়িতে উঠোনে মিটিং বসেছে। মিটিং ডেকেছেন রবীনের বাবা বদরুল সাহেব, তিনি একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। খুবই রাগী। এই রফিক নামের গ্রামের বোকাসোকা ছেলেটিকে প্রায়ই ভূতে ধরে শুনে তিনি তার ইন্টারভ্যু করছেন। উঠোনে বেশ ভিড়। রবীন ছাড়াও আছে তার ছোট বোন রাইসা। আর ওদের মা। আর গ্রামের আশপাশের লোকজন তো আছেই।

'তোমাকে ভূতে ধরে?'

'হুঁম্।'

'হুঁম্ কীরে, ক জ্বি স্যার।' পাশ থেকে বাড়ির কেউ একজন ধমক লাগায়।

'ভূতটা যখন আসে, কীভাবে আসে?'

'ছেমার মতো দেখি।'

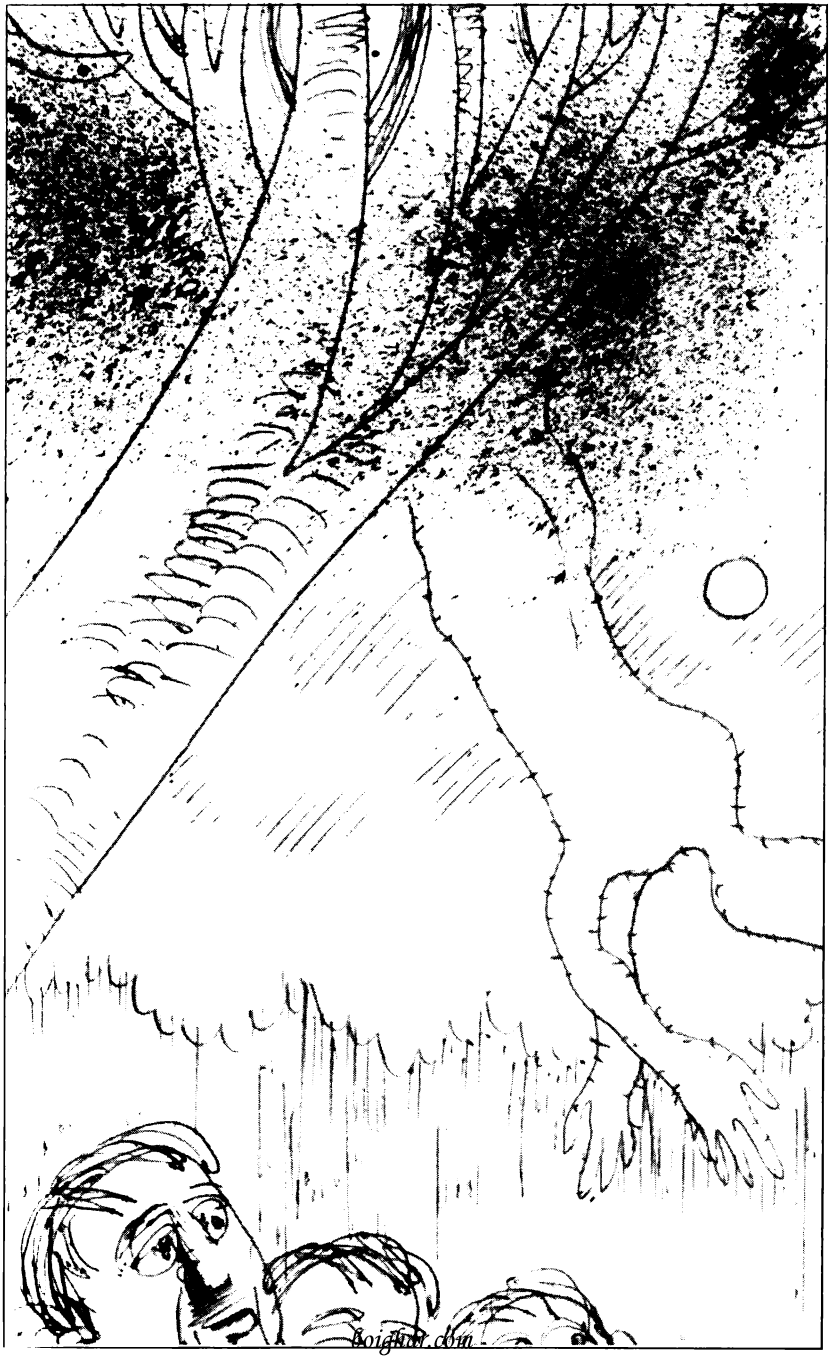

Boighar.com

'তারপর?'

'তারপর...' রফিক থেমে যায়।

'কী হলো বল?'

রাইসার ভয় ভয় লাগে। সে মায়ের শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে, 'মা, ছেমা কী?'

'ছায়া' ফিসফিস করে বলেন মিসেস মজুমদার, রাইসা-রবীনের মা।

'ছেমাটা আমার কাছে আসে...'

'তারপর?'

'তারপর আর দিশা থাকে না।'

'কী থাকে না?'

'জ্বে দিশা...আমার দিশা থাকে না।'

'মানে ধরেন গিয়া...হে বেহুশের মতো হয়া যায়।' পাশ থেকে এক বিচক্ষণ গ্রামবাসী রফিকের হয়ে ব্যাখ্যা করেন।

'হুঁম্...' বদরুল সাহেব মাথা নাড়েন।

হঠাৎ করে বদরুল সাহেবের মনে হলো ছেলেটা অতিশয় ধুরন্দর। বাবা-মা নেই, এতিম ছেলে। নিজের স্বার্থ খুঁজে পেতে একটা ধান্দা বের করেছে। ভূতে ধরলে সবাই তাকে তোয়াজ করে, ভয় করে, এটা-ওটা খাওয়ায়। সে কারণেই সে ভেক ধরেছে। মনে মনে তখনই তিনি ঠিক করলেন এই ছেলেকে তিনি নিজের মত করে সাইজ করবেন।

সেদিনের মত প্রেত বিষয়ক মিটিং ভঙ্গ করা হলো। সবাই যে যার মত চলে গেল। শুধু রোগা পটকা রফিক বসে রইল বাড়ির উঠোনে। অবশ্য বদরুল সাহেব তাকে বসতে বলেছেন। তার একটা পরিকল্পনা আছে। তিনি আজ ভূত ছাড়াবেন। গ্রামের মানুষের কুসংস্কার ভেঙে দেবেন।

তিনি টের পেলেন ভেতরে ভেতরে তার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। আর্মিতে চাকরি করার সময় এই রোগটা হয়েছিল তার, কারণ ছাড়াই রেগে উঠতেন। যাকে-তাকে গালাগাল করতেন। এখন রিটায়ার্ড করেছেন যদিও কিন্তু অভ্যাসটা যায় নি। অবশ্য এই অভ্যাসটার জন্য তিনি খুব একটা চিন্তিত নন। তার যুক্তি হচ্ছে...আসলে কারণ ছাড়া তিনি রাগেন না। যেমন, এখন তিনি হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছেন রফিক নামের ১৩ বছরের এই ধুরন্দর ছেলেটি গ্রামের প্রতিটি মানুষকে বোকা বানিয়ে দিব্যি আছে।

এই ছেলেটিকে তিনি একটা শিক্ষা দেবেন। আজই দেবেন এবং এখনি দেবেন। নইলে এই ছেলে বড় হয়ে আরও যে কী দুই নম্বরী করবে...কে জানে।

'এই ছেলে, তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

'কোথায় যাচ্ছ বাবা?' রবীন ভয়ে ভয়ে জানতে চায়।

'তোমরা থাকো, আমি আসছি।'

'এই ভরদুপুরে আবার কোথায় যাচ্ছ?' স্ত্রীও বিরক্ত হলেন। তার আসলে এই হঠাৎ করে গ্রামে বেড়াতে আসাটাই পছন্দ হচ্ছে না। যত দ্রুত ঢাকা ফেরা যায় ততই মঙ্গল। রাইসাকে নিয়ে তিনি ঘুরে ঢুকে গেলেন। রবীন অবশ্য মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকল না। উঠোনের টুলটায় বসে পা দোলাতে লাগল। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাবার সঙ্গে যায়।

কিন্তু বাবাকে তারা ভয় পায়। বাবা নিজের থেকে না ডাকলে কখনও যায় না। রবীন মন খারাপ করে চেয়ে রইল বাবার দিকে। বাবা রফিকের হাত ধরে বাড়ির পেছনের দিকে যাচ্ছেন। রবীনের কেন যেন বাবার ভাব-ভঙ্গি ভাল মনে হলো না।

বদরুল সাহেব রফিকের হাত ধরে বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ে গেলেন। বেশ বড় পুকুর। আশেপাশে নিরিবিলি। কেউ নেই। বদরুল সাহেব একটা বাঁশের চিকন কঞ্চি ভাঙলেন। রফিক অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

'রফিক!'

'হুঁম্।'

'হুঁম্ না, বল জি।'

'জি।'

'তোরে ভূতে ধরে?'

'জি।'

'কেমনে ধরে?'

'একটা ছেমা আসে...'

'ছেমা আসে, না?'

'হুঁম্'।

boighar.com

'আবার হুঁম্?' আচমকা শপাং করে বাঁশের কঞ্চিটা দিয়ে রফিককে মারেন বদরুল সাহেব। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'ছেমা না?...তোমার ছেমা আমি বের করছি...'

ব্যথার জায়গাটা চেপে ধরে রফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বদরুল সাহেবের দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'ছেমা আসতেছে...ছেমা আসতেছে...'

বদরুল সাহেবের মাথার দু'দিক দপ-দপ করছে রাগে। চণ্ডাল রাগ যাকে বলে। দ্বিতীয়বার কঞ্চিটা তুলেছেন উপরে। আর তখনই তিনি দেখলেন রফিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার শরীরের উপর সূর্যটা, কাজেই ছায়াটাও ছোট্ট। কিন্তু ছোট্ট ছায়াটা একটা মানুষের মত উঠে আসছে ... রফিকের পেছন দিয়ে...বাঁশের চিকন কঞ্চিটা হাত থেকে পড়ে যায় বদরুল সাহেবের। দপদপে চণ্ডাল রাগটা হঠাৎ করে আর নেই। গলা শুকিয়ে আসছে...তিনি এটা কী দেখছেন...? তিনি সাহসী মানুষ কিন্তু তার হৃৎপিণ্ডটা এখন মনে হচ্ছে গলার কাছে আটকে গিয়ে দপ-দপ করছে...! তিনি চিৎকার করে একটা কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। হাঁটুর কাছটায় জোর পাচ্ছেন না...মনে হচ্ছে তার ঘাড়ের দু'পাশে ধরে কেউ জোর করে বসিয়ে দিতে চাচ্ছে...আর রফিকের সেই ছেমাটা কেমন এক অদ্ভুত অবয়ব ধরে আস্তে আস্তে রফিককে অতিক্রম করে উঠে আসছে তার দিকে...

বিকেলে সবাই বদরুল সাহেবকে আবিষ্কার করল পুকুরের পাশের ডোবাটায় যেখানে গোবর পঁচানো হয় তার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, উঠতে পারছেন না। চোখ দুটো টকটকে লাল। ডোবার পাশে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে রফিক। বিকেল হয়ে গেছে বলে তার আশেপাশে কোনো ছায়া নেই। সে একা।

সবাই ছুটে এসে বহু কষ্টে টেনে-হিঁচড়ে তুলল বদরুল সাহেবকে। মিসেস মজুমদার চিৎকার করে কেঁদে ফেললেন। রবীন-রাইসা অবাক হয়ে তাদের রাগী বাবাকে দেখছে! এই অবস্থা তার? কীভাবে হলো? রফিক তখনও দাঁড়িয়ে। রাইসা-রবীনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রফিকের। কেন যেন রাইসা-রবীনের দুজনের একসঙ্গেই মনে হলো, দূর থেকে রফিক বলল, 'তোমাদের বাবাকে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই... ।'

স্বপ্ন

মহসিন অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল রাতে। তার ছেলেবেলার বন্ধু ইদ্রিসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ইদ্রিস বলছে–

'আরে দোস্ত কতদিন পর দেখা। কেমন আছ?'

'ভাল।'

'তুমি?'

'ভাল।

'চলো কোথাও বসি।'

'চলো।'

তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢুকল। ইদ্রিস হঠাৎ বলল,

' দোস্ত, ব্লাডারে খুব প্রেসার ফিল করছি... একটু ছেড়ে আসি।'

'আশ্চর্য আমারও।' মহসিন বলে।

তারপর তারা দুজন দুটো বাচ্চা ছেলের মত ব্লাডার খালি করতে লাগল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আর ঘুমটা তখনই ভেঙে গেল মহসিনের। সে আশ্চর্যহয়ে আবিষ্কার করল বিছানা ভিজে চপ চপ করছে... অ্যামোনিয়ার গন্ধ। ছি ছি এটা কী হলো? পাশে স্ত্রী গভীর ঘুমে অচেতন। হতভম্ব হয়ে শুয়ে রইল মহসিন। এটা কী হলো? একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষ সে, একটা নামকরা কোম্পানির এমডি...আর সে ছোট বাচ্চাদের মত বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে বিছানা ভিজিয়ে ফেলল! স্ত্রীকে কী বলবে! এর কী ব্যাখ্যা? কোনো অসূখ হলো না তো তার?

কয়েকদিন পরও একই ঘটনা ঘটল। স্বপ্নে ছেলেবেলার ক্লাসমেট ইদ্রিসের সাথে দেখা। সেই আগের মতই...সেই একই স্বপ্ন...

'আরে দোস্ত, কতদিন পর দেখা। কেমন আছ?'

'ভাল।'

boighar.com

বইঘর.কম

'তুমি?'

'ভাল।'

'চলো কোথাও বসি।'

'চলো।'

তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢুকল। ইদ্রিস হঠাৎ বলল,

'দোস্ত, ব্লাডারে খুব প্রেসার ফিল করছি... একটু ছেড়ে আসি।'

'আশ্চর্য আমারও।' মহসিন বলে।

আর তখনই সে সতর্ক হয়ে যায়। স্বপ্নের ভেতরই মনে পড়ে যায় আগের স্বপ্নের কথা...বিছানা ভিজিয়ে ফেলার কথা। সে বলল,

'তুমি যাও।'

'কেন যাবে না ব্লাডার খালি করতে?'

'না।'

'আচছা, তা হলে আমি আসছি...। ইদ্রিস একটা গাছের নিচে দাঁড়ায়। আর তখনি মহসিনের নজর পড়ে ঝকঝকে একটা টয়লেটের দিকে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এত সুন্দর টয়লেট হলো কবে? একটু আগেও ছিল না। যেন মহসিন টয়লেট করবে দেখেই এই টয়লেটটা তৈরি করা হয়েছে। মহসিন মন্ত্রমুগ্ধের মত টয়লেটে ঢোকে...ব্লাডার খালি করতে...আহ্ আরাম...তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল মহসিনের! সে হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করল..থই-থই পেচ্ছাপের ভেতর সে শুয়ে আছে। আবার একই ঘটনা ঘটল!!

'তুমি জলদি ডাক্তার দেখাও।' স্ত্রী শোভা গম্ভীর মুখে বলে।

'হ্যাঁ দেখি...' আমসি মুখে বলে মহসিন।

'দেখি না, আজই যাও...কিছু একটা গোলমাল হয়েছে তোমার।'

সাধারণ ডাক্তাররা তেমন কোনো সিমটম পেল না। তবে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট অবশ্য অন্য লাইনে গেল। নানান প্রশ্ন করল তাকে–

'আপনি যে বন্ধুকে স্বপ্নে দেখেন, মানে যাকে দেখলে আপনার ছোট কাজটা আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে, সে আপনার কেমন বন্ধু ছিল?

'ভালই তো।' 'বলেই মনে হলো মহসিনের কথাটা কি সে ঠিক বলল? ইদ্রিস কি আদৌ তার বন্ধু ছিল? একটু বদমাইশ টাইপের ছিল সে...অত ঘনিষ্ঠতা কি ছিল?'

'তার সাথে কি ছেলেবেলায় আপনার কোনো সমস্যা হয়েছিল?'

'না...তবে...'

boighar.com

'তবে?'

'তবে ওকে আমি ভয় পেতাম, এটা সত্যি।'

'কী রকম?'

'যেমন ধরুন...আসলে ও একটু অন্য রকম ছিল।'

'আরেকটু পরিষ্কার করে বলুন।'

'আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে ওকে কেন যেন আমি ভয় পেতাম, কোনো কারণ ছাড়াই...ওর চেহারায়...'

'শেষ কবে ওর সাথে দেখা হলো?'

'ও আসলে ব্যক্তিগত জীবনে খুব সুবিধা করতে পারে নি। ছোটখাটো ব্যবসা করে। এই কিছুদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল নিউ মার্কেটে। সেটাই শেষ দেখা।'

'তখন কি ভয় পেয়েছিলেন ছোটবেলার মত?'

'না ঠিক ভয় পাইনি তবে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। মনে হচ্ছিল...'

'কী মনে হচ্ছিল?'

'মনে হচ্ছিল ওর সাথে দেখা না হলেই ভালো হতো...'

'তার ঠিকানা জানেন?'

'না। ইচ্ছে করেই ঠিকানা রাখিনি।

'ও জানে আপনার ঠিকানা?'

'না।'

'হুঁম্।' বয়স্ক সাইকিয়াট্রিস্ট গম্ভীর হয়ে কী সব নোট নিতে লাগলেন দ্রুত হাতে।

আর কী আশ্চর্য দুদিন পরই হঠাৎ করেই ইদ্রিসের সাথে আবার দেখা হয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সে তার নতুন কেনা প্রভোক্স গাড়িটা চালিয়ে। হঠাৎ কী মনে করে গাড়িটা সাইড করল সিগারেট খাওয়ার জন্য।

দিনে পাঁচটার বেশি সিগারেট সে খায় না। কারণ পাঁচটা সিগারেট যারা খায় তারা নাকি নন স্মোকার। সারাদিনে চারটা হয়েছে। পাঁচ নম্বরটা ধরানো যাক।

সিগারেট কিনে ধরাতে যাবে, পেছনে কে যেন কাঁধ স্পর্শ করল তার, ফিরে দেখে ইদ্রিস!

'দোস্ত কেমন আছ?'

'ভালো তুমি এখানে?'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমাকে দেখে দাঁড়ালাম।' মহসিনের কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। তার ভেতর থেকে কেউ যেন বলছে মহসিন–'ভাগো, এর সঙ্গে বেশিক্ষণ থেকো না।'

ততক্ষণে মহসিনের হাত চেপে ধরেছে ইদ্রিস। 'চলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বসে একটু গল্প করি...আবার কবে দেখা হয়।'

'না মানে, আমার একটু কাজ ছিল...আরেকদিন...' দুর্বল গলায় বলে মহসিন।

'আরে কাজ তো সারাজীবনই করবা...একটু বসি' বলে জোর করে তার হাত ধরে মহসিন রাস্তা পার হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢোকে। মহসিন আশ্চর্যহয়ে আবিষ্কার করে সবকিছু স্বপ্নের মত মিলে যাচ্ছে! এখন ইদ্রিস নিশ্চয়ই বলবে...এবং বললও...'দোস্ত, ব্লাডারে খুব প্রেসার ফিল করছি... একটু ছেড়ে আসি।'

আর ঠিক তখনই মহসিনও তার নিজের ব্লাডারে প্রচণ্ড প্রেসার ফিল করে। অথচ একটু আগেও কোনো চাপ অনুভব করেনি। রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে জল বিয়োগের ঘোর বিরোধী মহসিন। ছোটবেলায় না বুঝে করেছে কিন্তু এই বয়সে...কিন্তু প্রচণ্ড প্রেসার হচ্ছে...সে উঠে দাঁড়ায় এখন ব্লাডার খালি করলেই তো আর বিছানা ভেজার ভয় নেই। এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ইদ্রিসের মতই আরেকটা গাছের নিচে কাজটা সারল মহসিন... খুব আরাম পেল।

দুজনেই ফিরে এসে বেঞ্চটায় বসল। পাশাপাশি।

'বুঝলা, পুরা ডায়াবেটিসে ধরছে! যখন-তখন ধইরা বসে। চাইপা রাখতে পারি না। তোমার কী অবস্থা?'

'না, ডায়াবেটিস নাই।' তখনই চোখটা গেল ইদ্রিসের প্যান্টের দিকে। প্যান্টটা রক্তে ভেজা...জবজব করছে।

'একি, তোমার প্যান্টে রক্ত কেন?'

'বুঝলাম না, হঠাৎ কইরা প্রস্রাবের সাথে আজ রক্ত গেল...'

'কিন্তু এত রক্ত...চলো কোনো ক্লিনিকে যাই...'

'না না ঠিক আছি...একটা সিগারেট দেও খাই...'

'সিগারেট তো নাই।'

'আমার কাছে একটা থাকতে পারে।' বলে ইদ্রিসে পকেটে হাত দেয়। রক্তে ভেজা একটা দুমড়ানো-মুচড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

boighar.com

তারপর কাঁপা হাতে সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে ইদ্রিস,

'দোস্ত...তুমি যাওগা...'

'মানে?'

'মানে এই জায়গাটা সন্ধ্যার পর ভাল না...মনে নাই একবার এইখানেই তো এক বিখ্যাত লেখকরে কোপাইল...রক্তারক্তি কাণ্ড...তুমি যাও...'

'কিন্তু তোমাকে এভাবে রেখে...'

'না না যাও...! মহসিন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল ইদ্রিসের চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ। যেন মহসিন উঠে গেলেই তার আরাম হবে।

ইদ্রিসকে রেখেই উঠে গেল মহসিন। নিজের গাড়িতে উঠে ছুটল শাহবাগের দিকে। আর্ট কলেজের সামনে পাঁচ-ছয় জন লোক তার গাড়ি থামানোর জন্য হাত তুলল, সামনেই বেশ একটা জটলা। মহসিন থামাল গাড়ি। একজন জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল,

'ভাই একটু হেল্প করুন।'

'কী হয়েছে?'

'এই মাত্র একজন ট্রাক চাপা পড়েছে। মেডিকেলে নিতে হবে। কোনো গাড়ি থামছে না। লোকটা মারা যাবে।'

'আচ্ছা ওঠান।'

পেছনের দরজা খুলে দেয় মহসিন। ধরাধরি করে একটা লোককে ওঠায় ওরা। লোকটার নিচের অংশ রক্তে ভিজে যাচ্ছে...চপ-চপ করছে রক্ত। মহসিন অবাক হয়ে দেখল লোকটা আর কেউ না, ইদ্রিস...দেখেই বোঝা যাচ্ছে মৃত...স্পট ডেড! অল্প হাঁ করে আছে তার ছেলেবেলার ক্লাসমেট ইদ্রিস।

সব ঝামেলা শেষ করে মহসিন যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন রাত এগারোটা। বাসা থেকে ফোন এল শোভার।

'তুমি কোথায়?'

'রাস্তায়...আসছি।'

'তুমি কি দুপুরে বাসায় এসেছিলে?'

'মানে?'

'নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে ছিলে। যথারীতি আবার বিছানা ভিজিয়েছ... তোমার কি রক্ত যাচ্ছে? চাদরটা তো একদম লাল হয়ে আছে!' শোভার গলায় উদ্বেগ।

সুরাইয়া

'তুই ভূত বিশ্বাস করিস?'

'মাঝে মাঝে করি'।

'মানে?'

'মানে মাঝেমধ্যে ধর যখন রাতের বেলা ভূতের গল্প-টল্প পড়ি, তখন একটু একটু বিশ্বাস করি...ভয় ভয় লাগে।'

'সে তো বাটে পড়লে আমিও একটু একটু কেন, বেশিই করি।'

'কেন হঠাৎ ভূত নিয়ে পড়লি কেন?'

'বাহ্ আজকের আবহাওয়াটা দেখছিস না? কেমন ভূত ভূত ভাব...বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, দমকা হাওয়া...ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। সে কারণেই...রাতও কম হয়নি, বাসায় শুধু তুই আর আমি...'

'সত্যি তুই তো আমাকে ভয় লাগিয়ে দিলি! জলদি একটা সিগারেট দে...আগুনের আশপাশে ভূত থাকে না।'

ইস্তি তার বেনসনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বাড়িয়ে ধরে সাগরের দিকে। নিজেও একটা ধরায়।

'আসলে ভূত ফুত কিছু নেইরে। থাকলে নিশ্চয়ই দেখতাম। বয়স তো আর কম হলো না।'

'আমি কি বলেছি ভূত আছে?'

'তুইই তো ভূতের প্রসঙ্গটা তুললি!'

'ভূত নেই তবে ভূতের ভয় আছে।'

'তা মন্দ বলিস নি।'

'তা হলে চল ভূতের ভয় পাওয়া যাক!'

'মানে?'

'মানে চল প্ল্যানচেট করি।'

boighar.com

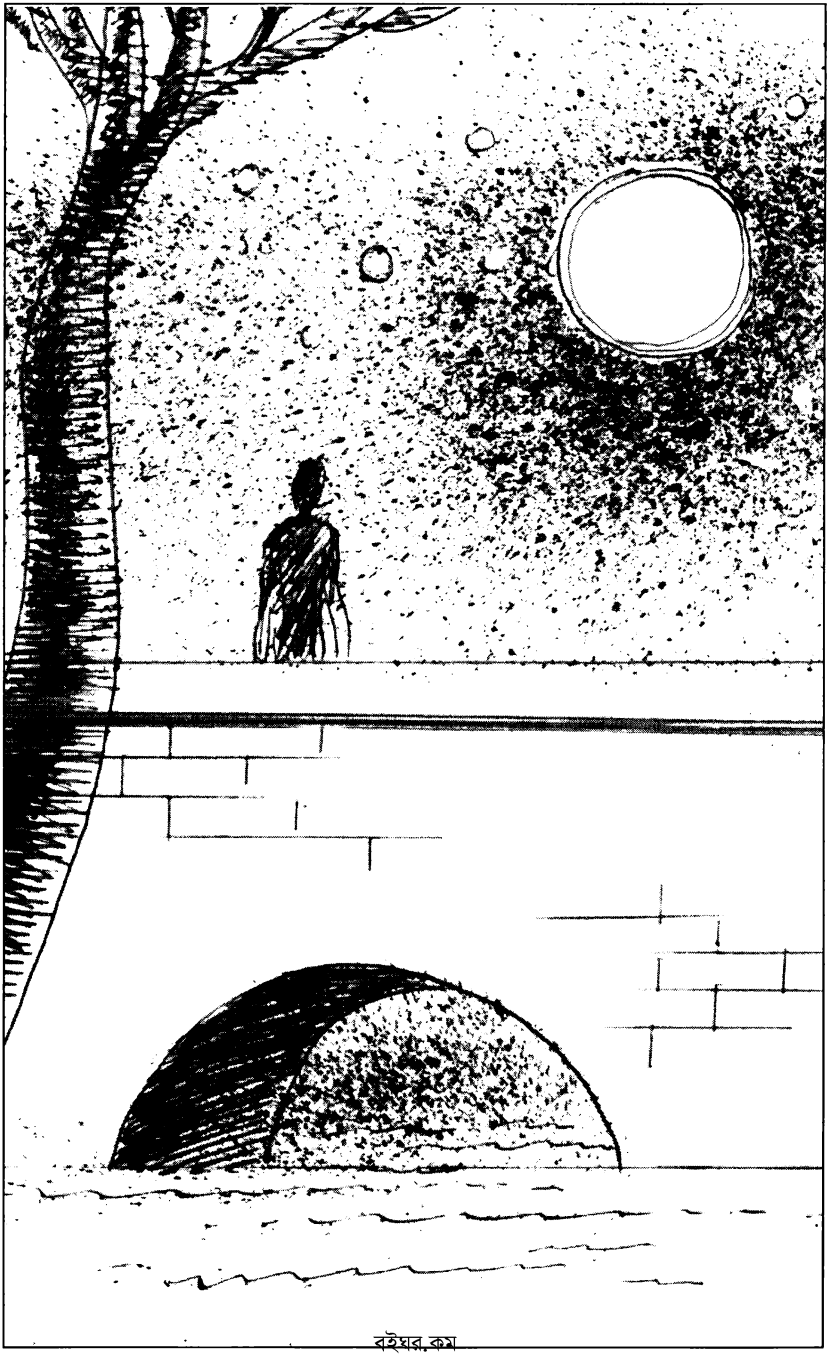

বইঘর.কম

'আরে শোন না, ওই যে গোল টেবিলটা দেখছিস না, ওটা হবে আমাদের ওয়াইজা বোর্ড, ওটার উপর তুই আমি দুই হাত দিয়ে বসে থাকব। তোর বাম হাতের উপর আমার ডান হাত!'

'তাতেই ভূত চলে আসবে?'

'না, ভূত আসবে না।'

'তা হলে আসবেটা কে?'

'আসবে আত্মা।'

'বলিস কী, গোলটেবিলে হাত দিয়ে বসলেই আত্মা চলে আসবে?'

'না, গোলটেবিলের মাঝখানে জ্বলবে একটা মোম আর আমরা এক মনে ডাকব কোনো বিদেহী আত্মাকে, যে মারা গেছে অপঘাতে।'

'কাকে ডাকব?'

'এমন কাউকে, যে আমাদের দুজনেরই পরিচিত কিন্তু অপঘাতে মৃত।'

'মানে?'

'মানে যার মৃত্যুটা স্বাভাবিক হয়নি। যার আত্মাটা পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারছে না! অস্থির হয়ে ঘুরছে পৃথিবীর আলো বাতাসে।'

'হুঁম্, বেশ...তা হলে সেই রকম একটা আত্মাকে ডাকা যাক। ব্যাপারটা যখন এতই সহজ! তা কাকে ডাকবি?'

'কেন হানিফ স্যারকে।'

'তাই তো! হানিফ স্যার আমাদের দুজনকেই পছন্দ করতেন। বেচারা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন। কী নির্মম মৃত্যু!'

'না, হানিফ স্যারকে ডাকা ঠিক হবে না। বুড়ো মানুষকে ডেকে এনে লাভ নেই। বরং চল সুরাইয়া আপাকে ডাকি।'

'ঠিক বলেছিস, সুরাইয়া আপা। যার প্রেমে পড়েছিলাম তুই আমি এক সঙ্গে।' দুজনেই হেসে উঠল।

থামিয়ে বিষণ্ন গলায় সাগর বলে, 'কিন্তু তার মৃত্যুটা ছিল ভয়ানক।'

'বাদ দে। ওই স্মৃতিটা মনে করতে চাই না।

'প্ল্যানচেটে বসলে ওই ভয়ঙ্কর স্মৃতিটা মনে করেই তাকে ডাকতে হবে রে!'

'বেশ তবে ডাক সুরাইয়া আপাকে!'

boighar.com

একটু পর তাদের দুজনকে ঘরের মাঝখানে দেখা গেল। টেবিলটার দুপাশে দুজন দুটো চেয়ার নিয়ে বসা, মাঝখানে একটা মোম জ্বলছে! অন্য কোনো আলো নেই। দুজনেই দুই হাতে স্পর্শ করে রেখেছে গোলটেবিল, একজনের বাম হাতের উপর আরেকজনের ডানহাত!

কতক্ষণ বসেছিল তারা কে জানে! 'নাহ্ বাদ দে তো,' বলে উঠে পড়ে সাগর।

'আরেকটু বস না...দেখি ঘণ্টাখানেক...তুই কি ভয় পাচ্ছিস?'

'ধুর! আচ্ছা দাঁড়া একটা সিগারেট খেয়ে নিই! তুই খাবি?'

'না।'

সাগর সিগারেটটা ধরাতে যাবে তখন হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার ঠাস করে সশব্দে জানালাটা খুলে গেল। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির একটা ঝাপটা এসে ঘরে ভেতরটা সব ওলট-পালট করে দিল মুহূর্তে। প্রথমেই নিভে গেল মোমটা। সিগারেট আর ধরানো হলো না সাগরের...তখনই গন্ধটা নাকে এল সাগর আর ইস্তির।

'ইস্তি?'

'হুঁম্?'

'একটা গন্ধ...!'

'পেয়েছি...'

গন্ধটা ওদের দুজনের খুব পরিচিত। এই বিশেষ গন্ধটা একটা পারফিউমের। সুরাইয়া আপা ব্যবহার করতেন। ধপ করে সাগর খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'দোস্ত, আমার ভয় লাগছে।'

'ভয় কীসের? সুরাইয়া আপাকে ভয় কীসের?'...তারপর গলা একটু উঁচু করে ইস্তি বলল, 'সুরাইয়া আপা, তুমি কি এসেছে? এখানে আমি আর সাগর।'

কোনো উত্তর এল না। সাগর চট করে লাইটার দিয়ে মোমটা জ্বালাল। ঘরে কেউ নেই। এমন কি ইস্তিও নেই! একটু আগেও ইস্তি সামনের চেয়ারটায় বসে সুরাইয়া আপাকে ডাকল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সাগর ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, 'ইস্তি, তুই কই?'

'ফাজিলটাই কি তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে! লুকিয়েছে কোথাও?' এ সময় চাপা একটা হাসির আওয়াজ পেল সাগর। হাসিটা

ছেলেরও হতে পারে মেয়েরও হতে পারে। সাগরটা মোটামুটি নিশ্চিত হলো ইস্তিই তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে! সে এখানেই ঘরের ভেতর কোথাও ঘাপটি মেরেছে। সে দ্বিতীয়বার চেঁচাল, 'ইস্তি ইস্তি' তখনই দ্বিতীয়বার বাতাসের দমকা হাওয়ায় আবার দড়াম করে জানালার দুটো পাল্লাই খুলে গেল। দপ করে নিভে গেল মোমটা। বাইরে বজ্রপাত হচ্ছে। বজ্রপাতের আলোয় সাগর দেখল ইস্তি তার চেয়ারেই বসে আছে! তার মুখটা হাসি হাসি।

'কীরে ইস্তি, তুই কোথায় গিয়েছিলি? আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!'

'তাই!'

সাগরের রক্ত হিম হয়ে গেল। ইস্তি 'তাই' শব্দটি বলল মেয়েলি গলায়।

'ইস্তি তোর কী হয়েছে?' ভীত গলায় বলল সাগর।

'কিছু হয় নি! তোমরা ডাকলে, তাই এলাম!'

সুরাইয়া আপার গলা! প্রচণ্ড ভয় পেল সাগর। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু ভয় পাওয়ার তো কথা না। এই সুরাইয়া আপার সঙ্গে কত আড্ডা মেরেছে...কিন্তু এখন তার সামনে...

'তু-তুমি সুরাইয়া আপা?'

'হ্যাঁ। চিনতে পারছ না?'

সাগরের গলায় কথা আটকে যায়। তাকিয়ে দেখে ইস্তি কেমন এক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাত দুটো গোলটেবিলের উপর থরথর করে কাঁপছে! কম্পিত হাতে সাগর আবার মোমটা জ্বালায়। দপদপ করছে মোমটা। যে কোনো মুহূর্তে আবার নিভে যেতে পারে। সাগর ছুটে গেল জানালাটা বন্ধ করতে। জানালাটা বন্ধও করল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে মোমটা ছোট হয়ে নিভে আসছে...আর সেই অল্প আলো-আঁধারে সাগর পরিষ্কার দেখতে পেল ইস্তি নয়, গোলটেবিলটার পাশে স্থির হয়ে বসে আছে সুরাইয়া আপা! তার লম্বা চুল, শাড়ির আঁচল উড়ছে! সাগর বুকে প্রচণ্ড একটা চাপ অনুভব করল...দম আটকে আসছে। একটা চিনচিনে ব্যথা বাম হাতে ছড়িয়ে পড়ছে... ডান হাতে বুকটা চেপে ধরে মেঝের

boighar.com

উপর বসে পড়ল সাগর। মোমটা নিভে গেছে...হাট করে জানালাটা খুলে গেল... হু হু করে বৃষ্টি আর বাতাস ঢুকছে...তখনও বসে আছে সুরাইয়া আপা...বাতাসে তখনও তার চুল উড়ছে...হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই সেই সুরাইয়া আপাই বসে আছেন...জ্ঞান হারানোর আগে সাগরের সর্বশেষ চেতনা তাকে সেরকম ধারণাই দিল!

বইঘর.কম

ছুঁচো

বাক্সটা ছোট্ট কাঠের। হঠাৎ করে বোঝার উপায় নেই যে এটা একটা ফাঁদ। ইঁদুর বা ছুঁচো ধরার ফাঁদ। এক সময় এগুলো বেশ দেখা যেত, এখন আর দেখা যায় না। আসলে আজকাল ফাঁদ পেতে কেউ ইঁদুর বা ছুঁচো মারে না। ইঁদুর মারার নানান ওষুধপত্র বের হয়েছে। হয়ত সেগুলোই ব্যবহার করে।

মকবুল সাহেবের কেস অবশ্য আলাদা। তার বাসায় ইঁদুর নেই। কিন্তু ছুঁচোর প্রচণ্ড উপদ্রব। সন্ধ্যার পর পরই তাদের কিচ কিচ শব্দে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। প্রতিটি ঘরের কোনা ধরে তারা ছুটোছুটি শুরু করে। খুবই বিরক্তিকর। সেই কারণে বাজার থেকে এই ফাঁদ কেনা।

ফাঁদের দরজাটার সঙ্গে একটা স্প্রিং লাগানো, টান দিয়ে দরজাটা খুলে একটা ছোট্ট হুকের সঙ্গে লাগাতে হয়। আর খোলা দরজার সামনের ছোট্ট পাটাতনে রাখতে হয় কোনো খাদ্যদ্রব্য... ব্যাস ফাঁদ রেডি! ইঁদুর বা ছুঁচো খাবারটা খেতে যেই পাটাতনে ঢুকবে সঙ্গে সঙ্গে ঝপাৎ করে সেটা বন্ধ হয়ে ইঁদুর বা ছুঁচো বন্দি।

প্রথম ছুঁচোটা ধরার পর মকবুল সাহেব খুব উত্তেজনা বোধ করলেন। স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। ছেলে-মেয়েরা স্কুল- কলেজে থাকায় দেখতে পেল না।

কিন্তু তোমার ছুঁচো তো মরে নি। বাক্সের মধ্যে দিব্যি বেঁচে আছে।

আরে তাই তো।

ওটাকে মারবে কিভাবে?

আসলেও তাই এটাকে তো মারতে হবে। এই কাজটা কিভাবে করবেন তিনি। সেটা কিভাবে সম্ভব? আর তখনই বুদ্ধিটা মাথায় এল। ফাঁদটাকে কিছুক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলেই তো ব্যাটা দম আটকে মরবে।

boighar.com

বইঘর.কম

তাই করলেন তিনি বড় বালতিতে কাঠের ফাঁদটাকে মিনিট পাঁচেক ডুবিয়ে ধরে রাখলেন। ছুঁচোটা বিন্দু বিন্দু কিছু বুদ বুদ বের করে ছটফট করে এক সময় স্থির হয়ে গেল।

এভাবে গোটা সাতেক ছুঁচোকে মারলেন তিনি প্রথম সপ্তাহে। পরের সপ্তাহে আরো গোটা আটেক। কিন্তু কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

মানে?

স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে মকবুল সাহেব নড়েচড়ে বসেন। বারান্দায় বসে সকালে পেপার পড়ছিলেন তিনি।

'তুমি কোন কাজটার কথা বলছ?'

এই যে একটা একটা করে ছুঁচোকে মারছ।

তুমি চাও না ছুঁচোগুলো মরুক?

চাই। তাই বলে এই ভাবে?

কোন ভাবে?

মানে এই যে একটা একটা করে পানিতে ডুবিয়ে মারছ। আর যাই বলো পানিতে ডুবে মরা খুব কষ্টের ব্যাপার। হোকনা ছোট প্রাণী কিন্তু প্রাণী তো... মনে নেই আমি একবার পানিতে ডুবে গিয়েছিলাম...কি কষ্ট! কি কষ্ট!!

মকবুল সাহেব অবশ্য এভাবে বিষয়টা ভাবেন নি। এ সময় আলোচনায় যোগ দিতে এগিয়ে এল তার রহস্য-রোমাঞ্চ পড়া কন্যা যুথি।

বাবা, ওরা যদি প্রতিশোধ নেয়?

মকবুল সাহেব হো হো করে হেসে ফেলেন। 'তার মানে তুই বলছিস মরা ছুঁচোগুলো দল বেঁধে আমাকে হামলা করবে।'

হ্যাঁ। হতেও তো পারে ওদের আত্মা... ওদের আত্মারা নাকি অনেক শক্তিশালী... একটা গল্পে পড়েছি।

ঐসব গল্প পড়েই তোর মাথাটা গেছে।

না বাবা, আমি সিরিয়াস। কাল রাতে আমি এই নিয়ে ভয়ানক একটা স্বপ্নও দেখেছি।

স্বপ্ন দেখাও শেষ?

কি দেখলি স্বপ্নে? মা আগ্রহ দেখান।

দেখি আমাদের বাসার চারপাশে হাজার হাজার ছুঁচো...

boighar.com

তারপর?

তারা সব ছুটে আসছে আমাদের বাসার দিকে... হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। তারপর... তারপর আমি ভয়ের চোটে ছুটে বাথরুমে লুকালাম। বাথরুমের ভিতরেও ঢুকে গেল ওরা। আমি বাথটাবের পানির ভিতর গিয়ে দাঁড়ালাম...তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল।

হুঁম। ভয়ের স্বপ্ন ... সন্দেহ নেই। রাত জেগে আজগুবি বই পড়া বন্ধ করো। এ রকম স্বপ্ন আর দেখতে হবে না তোমাকে।

মা-মেয়েকে বিদায় দিয়ে, বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসলেন মকবুল সাহেব... তবে কি ছুঁচো মারা প্রজেক্ট বন্ধ করবেন? মনে হচ্ছে মা-মেয়ে বিষয়টাকে ভালভাবে নিচ্ছে না।

যাহোক সে রাতে মকবুল সাহেব ফাঁদ না পেতেই শুতে গেলেন। ছুঁচো মারা প্রজেক্ট আপাতত বন্ধ!

রাত দুটোর দিকে ঘুম ভেঙে গেল। তার সারা ঘরে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়েছে... কিচ কিচ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। সত্যিই তাই। ঘরের কোনা ধরে ধরে ছুটছে তারা সেই আগের মত...বরং যেন সংখ্যায় আরো বেশি। একবার ভাবলেন স্ত্রীকে ডেকে দেখান। কিন্তু মলি মরার মত ঘুমাচ্ছে। ডাকলেও উঠবে বলে মনে হয় না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে কিচ কিচ বন্ধ হয়ে গেল। যেন ছুঁচোর দল ভয় পেয়েছে।মকবুল সাহেব এগিয়ে গেলেন... না আর কোনো শব্দ নেই কিন্তু হঠাৎ মনে হল শব্দটা এখন আসছে বাথরুমের দিকে থেকে। বাথরুমের দরজা বন্ধ কিন্তু নিচ দিয়ে আলো আসছে। কেউ কি গেছে বাথরুমে? এই বাথরুম তার আর স্ত্রী মলির; আর কেউ ঢুকে না।

তাহলে কে ঢুকলো? আলো জ্বাললো কে? মলি তো ঘরে ঘুমাচ্ছে। দরজা ধরে টান দিলেন। আশ্চর্য দরজা খুললো না। ভিতরে ছুঁচোর কিচ কিচ শব্দ... যেন হাজার হাজার ছুঁচো বাথরুমে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। আবার দরজা ধরে টান দিলেন খুলে গেল দরজা।

না এবার আর কোনো ছুঁচোর শব্দ নেই। নিঃশব্দ বাথরুম। কিন্তু বাথটাব ভর্তি পানি টল টল করছে। বাথটাবটা কে ভরে রেখেছে? তিনি একটু এগিয়ে গেলেন। তার হঠাৎ মনে হল তিনি বাথরুমের ভিতরে গিয়ে

দাঁড়ালে বাইরে থেকে আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটল। যা তার চল্লিশ বছরের জীবনে এই বাথরুমে কখনই ঘটে নি। তার পা হড়কে গেল। তিনি ঘুরে পড়লেন। মাথাটা প্রথমে বাড়ি খেল শাওয়ারের শক্ত পাইপটাতে যেটা খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে। তিনি তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। বড় বাথটাব, একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ ডোবার জন্য ঐ বাথটাব যথেষ্ট। তিনি দুহাত ধরে উঠার চেষ্টা করলেন... মাথায় প্রচণ্ড ব্যথার কারণে শরীর যেন শক্তিহীন। তার নাক মুখ দিয়ে বুদ বুদ বের হল... তিনি ঝাপসা চোখে দেখলেন। তার চারপাশে বাথটাবের চারধারে অনেকগুলো ছুঁচালো মুখ। তারা একসঙ্গে কিচ কিচ কিচ...করছে.... কিচ কিচ কিচ...

boighar.com

ছায়া

শাহরিয়ার চৌধুরীর ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছে কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ করছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। অস্বস্তিকর। মনে হচ্ছে ঠিক ঘাড়ের কাছ কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি হাঁটলে তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। প্রায় গায়ের সঙ্গে লেগে লেগে। মাঝে মাঝে স্পর্শও যেন টের পান তিনি।

ব্যাপারটা প্রথম হয়েছিল বনানী বাস স্টপেজ-এর কাছে একটা দোকান থেকে সিগারেট কেনার সময়। সিগারেটটা ধরাতে যাবেন তখন হঠাৎ তার ঘাড়ের উপর একটা নিঃশ্বাস পড়ল যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। কেউ নেই কিন্তু তার মনে হল কেউ একজন নিঃশব্দে তার পিছন থেকে সরে গেলো। তিনি আবার ঘুরলেন। কেউ একজন আবার তার পিছনে থেকেই ঘুরতে লাগল যেন। হঠাৎ শাহরিয়ার খেয়াল করলেন দোকানদার অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

অবাক হওয়ারই কথা। একটা বয়স্ক লোক চরকির মতো ঘুরছে খামাকা খামাকা। লজ্জিত হয়ে সরে পড়লেন শাহরিয়ার।

কিন্তু ক'দিন ধরেই তিনি খেয়াল করেছেন ব্যাপারটা বেড়েছে। সেদিন অফিসে তার পি.এ. জাকিয়া তো বলেই ফেলল

'স্যার, আপনি মাঝে মাঝেই পিছনে ঘুরে কী দেখেন?'

'কই?'

'আমি খেয়াল করেছি আপনি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কিছু খোঁজেন।'

'তাই নাকি? বোধ হয় তোমাকেই খুঁজি।'

বলেই বুঝতে পারলেন ভুল করেছেন। তাঁর এই নতুন পি.এ. মেয়েটা তাঁর প্রতি একটু অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছে ইদানিং। গায়ে পড়ে কথা বলা তার স্বভাব... তিনি খেয়াল করেছেন। 'বোধহয় তোমাকেই খুঁজি' কথাটা বলে তাকে কথা বলায় আরো উৎসাহিত করা হল বোধ হয়। নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর রুমে ফিরে এলেন শাহরিয়ার।

bookhaul.com

শাহরিয়ার সুপুরুষ এবং একজন নিপাট ভদ্রলোক। তাঁর অফিসে তিনিই বস। একটা আইটি বিষয়ক সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এখনো বিয়ে করেন নি। সম্ভবত করবেনও না।

আশ্চর্যজনক হলেও তিনি সব সময়ই দেখেছেন তার পি.এ.রা তাঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। অবশ্য তিনি এসব প্রশ্রয় দেন না, কোনো অনৈতিক সুযোগও নেন না। তার মধ্যে কি মেয়েদেরকে আকর্ষণ করার কোনো ক্ষমতা আছে?

তাঁর জন্ম সংখ্যা ৯। ৯ এর মধ্যে নারী জাতিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। সংখ্যাতত্ত্বের একটা বইয়ে দেখেছিলেন। অবশ্য এসবে তাঁর বিশ্বাস নেই।

ঘড়ি দেখলেন শাহরিয়ার। অফিস টাইম পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। স্টাফরা সবাই নিশ্চয়ই চলে গেছে। এখন নিরিবিলিতে এক কাপ কফি খাওয়া যেতে পারে।

তিনি কলিং বেল চেপে পিয়নকে ডাকবেন... ঠিক তখনই লম্বা করে কেউ শ্বাস ফেলল তাঁর কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুরলেন... ঝট করে কেউ যেন সরে গেল। তাই মনে হল তার। ভুরু কুঁচকে গেল শাহরিয়ারের। তাঁর হয়েছেটা কী? তিনি কফি খাওয়ার চিন্তা বাদ দিলেন। টেবিলের নিচ থেকে রেড ওয়াইনের বোতলটি বের করে গ্লাসে ঢাললেন। চুক চুক করে খেতে লাগলেন।

চার পেগের মতো ঢালার পর তিনি স্পষ্ট টের পেলেন তাঁর পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে।

'কে?'

'আমি।' উত্তরটা শুনেছেন যে এটা শাহরিয়ার নিশ্চিত। আর এটাও তিনি নিশ্চিত যে এই মুহূর্তে এই অফিসে এখন আর কেউ নেই। কলিং বেল টিপলে রমিজ ছুটে আসবে। সে আছে, থাকার কথা। গেটে দারোয়ান। আর কেউ নেই। অন্তত তাঁর অফিস রুমে কেউ থাকার প্রশ্নই আসে না।

'আমি কে?'

'ছায়া।'

'মানে?'

'আপনার ছায়া।'

হঠাৎ রিভলভিং চেয়ারটা দ্রুত ঘুরালেন শাহিরয়ার। না কেউ নেই।

ঠিক এই সময় দরজায় শব্দ হল। শাহরিয়ার অবাক হয়ে দেখলেন কফি হাতে ঢুকছে জাকিয়া।

'তুমি?'

'স্যার আপনার কফি।'

'আমি কফি খাব তোমাকে কে বলেছে?'

'কেউ বলেনি স্যার! আমিই নিজ থেকে বানিয়ে আনলাম।'

'তুমি এখনো যাওনি কেন? কটা বাজে?'

'স্যার আটটা...'

'যাওনি কেন?'

'স্যার, আসলে একটা জরুরি কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'সেটা এসে বলতে পারতে।'

'তাই আসতাম কিন্তু আপনি কথা বলছিলেন... বোধহয় ফোনে...'

'ফোনে? ও আচ্ছা তা কী ব্যাপার বলো।'

'স্যার, আমার কিছু টাকার দরকার... অ্যাডভান্স।'

'অ্যাডভান্স দেয়ার কোনো সিস্টেম তো আমাদের এখানে নেই।'

'সেটা আমি জানি স্যার... কিন্তু স্যার আমার ভীষণ বিপদ।'

'কী বিপদ?'

'স্যার...' জাকিয়া ইতস্তত করে।

'ঠিক আছে বলতে হবে না। আচ্ছা কাল একাউন্টস থেকে আমার কথা বলে নিয়ে নিয়ো। এখন যাও।

'থ্যাংক য়ু স্যার।'

জাকিয়া চলে যাবার পর পিয়নকেও বিদেয় করে দিলেন শাহরিয়ার। দারোয়ান রইল। সে অবশ্য অফিসেই থাকে। শাহিরিয়ার একটা সিগারেট ধরালেন। তিনি সাধারণত অফিসে সিগারেট খান না। আজ ধরালেন। আবার মনে হল তাঁর পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে।

'কে?'

'ঐ যে বললাম ছায়া। আপনার ছায়া।'

boighar.com

'ছায়া তো সবার পিছনেই থাকে।'

'সবার পিছনেই থাকে, তবে সব ছায়া কথা বলে না।'

'তুমি কথা বলো?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ক্ষেত্র বিশেষে আমরা কথা বলি...'

'ক্ষেত্রটা কী?'

'মানুষের যেমন মৃত্যু আছে ছায়ারও তেমনি মৃত্যু আছে, মানুষ মরলেই ছায়া মরে। সাধারণত মানুষই আগে মরে কিন্তু কখনো কখনো ছায়াও আগে মরে... আর তখনই...

'তখনই?'

'তখনই ছায়ারা কথা বলতে শুরু করে...'

'তার মানে তুমি মরবে?'

'হ্যাঁ।'

'তা মরো... আমার পিছনে ঘুর ঘুর করছ কেন?'

ছায়া কোনো কথা বলল না এবার। শাহরিয়ারের মনে হল তাঁর নেশাটা আজ একটু বেশি হয়েছে। রেড ওয়াইনটা তিনি বেশ কয়েক পেগ খেয়েছেন যার ফলে এইসব উল্টাপাল্টা কী সব ছায়ার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। আসলে এই বয়সে আর একা থাকা বোধ হয় ঠিক না। একটা বিয়ে করলে কেমন হয়? বয়স কত হল? পঁয়তাল্লিশ? চেহারা স্বাস্থ্য এখনো মাশাল্লাহ খারাপ নেই। কাকে বিয়ে করা যায়? জাকিয়াকে? হঠাৎ জাকিয়ার নামটা মাথায় এল কেন? মেয়েটি ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না। কিন্তু ভীষণ আকর্ষণীয়া। কিন্তু ও কি আমাকে বিয়ে করবে? বলে দেখলে হয়...

'ছায়া তুমি কী আছ?'

'আছি।'

'তুমি কখন মরবে?'

'এইতো আর কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'বলো কী, এত তাড়াতাড়ি? তাহলে তো আমি আরো নিঃসঙ্গ হয়ে যাব...'

'ছায়ার মৃত্যু হলে যার ছায়া তারও মৃত্যু হয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আমি শেষ।'

এ সময় দরজায় শব্দ হল। পিয়ন রমিজ।

'স্যার নটা বাজে। বাসায় যাইবেন না?'

'যাব, আর একটু পরেই যাব। তুই চলে যা।'

'জ্বি, আইচ্ছা।'

রমিজ বিদেয় হবার একটু পরেই উঠে দাঁড়ালেন শাহরিয়ার চৌধুরী। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন। তিনি নিজেই ড্রাইভ করেন। আজ সাবধানে চালাতে হবে। তিনি আজ প্রায় মাতাল। গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'মি. ছায়া এখানো আছো?' কোনো উত্তর এল না।

রাস্তায় মোড় নিতে গিয়ে দেখেন বাস স্টপে জাকিয়া দাঁড়িয়ে। এত রাতে মেয়েটা একা দাঁড়িয়ে। নিশ্চয়ই বাসের জন্য। অবশ্য আশেপাশে দু'একজন লোক আছে। তিনি যতটা সম্ভব গাড়িটাকে জাকিয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে হর্ন দিলেন। জাকিয়া এগিয়ে এল।

'স্যার আপনি?'

'উঠে এসো তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'স্যার দরকার নেই... বাস এসে যাবে।'

'উঠে এসো জলদি।' প্রায় ধমকের সুরে বললেন শাহরিয়ার। জাকিয়া উঠে এল।

'তুমি কোথায় থাক?'

'একটা কর্মজীবি হোস্টেলে।'

'কোথায় সেটা?'

'লালমাটিয়ায়।'

'আজকাল ঢাকায় অনেক মেয়েদের কর্মজীবি হোস্টেল হয়েছে তাই না?'

'জ্বি স্যার।'

boighar.com

'এটা ভালো।'

'জ্বি।'

'তোমাকে যদি ওখানে না নামিয়ে আমার বাসায় নিয়ে যাই আপত্তি আছে?' বলে শাহরিয়ার তাকালেন তার দিকে। জাকিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বলল, 'না নেই।'

'তুমি জান তো আমি এখনো ব্যাচেলার।'

'জানি।'

'এই মুহূর্তে আমি মাতাল?'

'জানি।'

'তারপরও যাবে?'

'যেতে পারি।'

'গুড। আমি আসলে বিয়ে করার কথা ভাবছি। তোমার কি মনে হয় আমার বিয়ের বয়স চলে গেছে?'

'না।'

'তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

'স্যার, আপনি বোধ হয় আজ একটু বেশি ড্রাঙ্ক...

''তাতে কি? আমি তোমাকে যে প্রশ্নটি করেছি তার উত্তর দাও।'

'করব।'

'গুড। তোমার কি মনে হয় আজ রাতে কোনো কাজী অফিস খোলা পাব আমরা?'

'আমি জানি না স্যার।' শাহরিয়ারের ভুলও হতে পারে। মনে হল জাকিয়া এই প্রথম একটু লজ্জা পেল। লজ্জা পেলে সব মেয়েকেই আরো বেশি আকর্ষণীয় লাগে।

মগবাজার কাজী অফিস হয়ে জাকিয়াকে নিয়ে শাহরিয়ার যখন তার বাড়িতে ঢুকলেন তখন রাত বারোটা। বুয়া দরজা খুলে হা হয়ে গেল।

'হা করে দেখছ কি, জলদি টেবিলে ভাত দাও। আর তোমার ভাবীকে চট করে বেডরুমের বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।'

শাহরিয়ারও ড্রইংরুম এটাচড্ বাথরুমটায় ঢুকে গেলেন। আগে ফ্রেস হওয়া দরকার, নেশাটা পুরোপুরি কাটেনি এখনো।

ফ্রেশ হয়ে খাবার টেবিলে বসলেন দুজনে মুখোমুখি। জাকিয়া ঠিক ফ্রি হতে পারছিল না। মুখ নিচু করে ছিল। যেন লজ্জা পাচ্ছে। সে টের পাচ্ছিল বুয়া আড়াল থেকে জাকিয়াকে মাপছে। খাওয়ার টেবিলে খুব বেশি কথা হল না দুজনের।

নিজের ঘরে জাকিয়াকে নিয়ে প্রবেশ করে শাহরিয়ার হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জাকিয়া, দেখ তো আমার কোনো ছায়া আছে?'

'না স্যার।'

'সত্যি নেই? ভালো করে দেখে বল।'

'না স্যার। সত্যি নেই।'

'তুমি অবাক হচ্ছ না?'

'একটু হচ্ছি।'

'তুমি কি জান কখনো কখনো মানুষের মৃত্যুর আগে তার ছায়ার মৃত্যু হয়?'

'জানতাম না স্যার, জানলাম।'

'আমি এখন ছায়াহীন। একটু আগে আমার ছায়ার মৃত্যু হয়েছে।'

'স্যার, এখন থেকে আমিই আপনার ছায়া হব।'

শাহরিয়ার টের পেলেন জাকিয়া এগিয়ে এসে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। কি তুলতুলে নরম জাকিয়ার হাত। হয়তো সব মেয়েদেরই হাত এমন। শাহরিয়ার ঘুরে দাঁড়ালেন...। জাকিয়া? জাকিয়া কোথায়? ঘরে কেউ নেই। তিনি একা দাঁড়িয়ে। তিনি আবার চিৎকার করলেন, জাকিয়া...! জাকিয়া...!! তার চিৎকার শুনে বুয়া ছুটে এল।

'কী হইছে ভাইজান, চেঁচান ক্যান?'

'জাকিয়া কোথায়?'

'জাকিয়া কে?'

'আরে তোমার ভাবী, আমার সঙ্গে যে এল।'

boighar.com

‘কই, কেউ তো আসে নাই আপনার লগে। ঐ যে ঐসব ছাইপাশ খাইছেন... ধরছে... শুইয়া ঘুমান।’

দরজা বন্ধ করে বিরক্ত হয়ে বুয়া চলে গেল। হতভম্ভ শাহরিয়ার ধপ করে বিছানায় বসে পড়লেন। আর তখনি দেখলেন তার ছায়াটাকে। কে বলেছে তার ছায়া নেই... ঐ তো ছায়া।

‘ছায়া, তুমি আছ?’

‘স্যার, আছি আপনার সঙ্গেই।’ জাকিয়ার গলা। শাহরিয়ার কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন। বাম হাতের চিনচিনে ব্যথাটা বাড়ছে আস্তে আস্তে ... ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শরীরে...

বইঘর.কম

মেছো ভূত

পাশাপাশি এমন ধরনের সহাবস্থান সচরাচর দেখা যায় না। ডান দিকে কবরস্থান আর বাঁ দিকে শ্মশান। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তাটা চলে গেছে সোজা দক্ষিণ দিকে মূল শহরের দিকে। শ্মশান আর কবরস্থানের কারণেই কিনা কে জানে। মাঝখানের ঐ সরু রাস্তাটা কেউ ব্যবহার করে না। রাতে তো প্রশ্নই ওঠে না, দিনেও না। তবে অমর সাহার ভয়ডর বিশেষ নেই। তার উপর ঐ রাস্তাটা দিয়ে গেলে তার সময় বেঁচে যায় অনেকখানি, কাজেই শুধুমাত্র ভূতের ভয়ে তিনি ঐ রাস্তা ছাড়তে নারাজ। তবে রাতের বেলা তিনি ঐ রাস্তা দিয়ে সচরাচর চলাচল করেন না। সন্ধ্যার দিকে অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে এই রাস্তাটাই বেছে নেন। কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু একদিন সমস্যা হল।

দেড়শ টাকা দিয়ে একটা ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি, সাথে কিছু শাকসবজি। তিনি যখন সেই সরু গলিতে ঢুকলেন তখনো পুরো সন্ধ্যা হয়নি। তবে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। বাতাসে কেমন একটা ভেজা গন্ধ। বৃষ্টি হবে নাকি কে জানে। শ্রাবণ মাসের আজ শেষ দিন, কে জানে হলে হতেও পারে। তিনি পা চালালেন। গলির শেষ মাথায় কিছু একটা নড়ে উঠল যেন। ধ্বক করে উঠল তার বুকটা। ভূত টূত না তো? না ভূত না, একটা বামন টাইপের ছোট্টখাট্ট মানুষ দাঁড়িয়ে। সারা শরীর পানিতে ভেজা। কিন্তু অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে কেন! তাও সারা গলিটা জুড়ে।

'এই কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? সরে দাঁড়াও।'

'ছার, আমারে চিনলেন না?'

boighar.com

'না। কে তুমি?'

'আমি ছার পাংশা গ্রামের আছিলাম।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'হেই আরো দক্ষিণে।'

'এখানে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে কী করছো? কী করো?'

'ছার আমি কিছু করি না। আমি মেছো ভূত।'

'মেছো ভূত।'

'মাছ খাই। আপনের ব্যাগের ইলিশ মাছটা দিয়া যান।'

'ফাজলামো করিস? পথ ছাড়!'

এক ধমকেই কাজ হল। কেমন যেন বিড়ালের মতো লাফ দিয়ে ছোট্টখাট্ট লোকটা সরে গেল।

অমর সাহা জোরে হাঁটা দিলেন। হঠাৎ কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে উঠল তার। তিনি যে ইলিশ মাছ কিনেছেন ব্যাটা টের পেল কী করে? পিছনে তাকিয়ে দেখেন লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী একটা খাচ্ছে।

তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে।

বাড়ি এসে স্ত্রী রেণুর হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে বললেন, 'ইলিশ মাছটা ভাজি করো কয়েক টুকরো।'

'কত নিল?'

'ম্যালা... ও শুনে তোমার কাজ নেই। বাচ্চারা সব কোথায়?'

'দোতালায় খেলতে গেছে বোধ হয়।' বলে ব্যাগ নিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন।

বাথরুমে মুখ ধুচ্ছিলেন অমর। স্ত্রী রেণু এসে দাঁড়ালেন বাজারের ব্যাগ হাতে।

'তোমার ইলিশ মাছ কোথায়?'

'মানে?'

'ব্যাগে তো কোনো মাছ নেই।'

'কী বলছ, মাছ নেই মানে?' ব্যাগ হাতড়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন অমর। তবে কি সেই বামনটা...? সে কিছু একটা খাচ্ছিল।!

'বোধহয় রাস্তায় কোনো ভাবে পড়ে টড়ে গেছে।'

'পড়বে কিভাবে? মাছটা ছিল একেবারে তলায়, উপরে শাকসবজি...তাহলে কি...?'

'তাহলে?' স্ত্রী জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'রাস্তায় মেছো ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম।'

'কী বলছ এসব?'

অমর সব খুলে বলল। শুনে স্ত্রী রেণু হেসে উঠলেন।

'তোমার আসলে মাছ হারিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হয়ে বসো, আমি চা করে আনছি।' অমর বারান্দার চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন। পুরো ব্যাপারটা তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।

সপ্তাহখানেক পরে অমর আবার একটা মাছ কিনলেন। এবারও ইলিশ মাছ। এবার কী মনে করে গোরস্থান আর শ্মশানের রাস্তা দিয়ে গেলেন না। তাছাড়া রাতও হয়ে গেছে। ভূত প্রেতে তার বিশ্বাস নেই, তারপরও মেছো ভূত সংক্রান্ত ব্যাপারটা তার মাথায় গেঁথে গেছে। তিনি একটা রিকশা নিলেন। রিকশাটা গলির মুখে এসে থেকে গেল।

'কী হল?'

'ছার, চাক্কাডা ফাইসা গেছে।'

ধ্বক করে উঠল অমরের বুকটা। গলাটা ভীষণ চেনা। আরে এ তো সেই মেছো ভূত। ছোট্টখাট্ট বামন টাইপ।

'তু-তুমি?'

'ছার, চাক্কাডা ফাইসা গেছে। রিকশা আর যাইব না। বাকিডা হাঁইটা যান গা। ভাড়া লাগবো না। খালি মাছটা দিয়া যান।'

'তুমি মেছো ভূত?'

'ছার, তাইলে চিনছেন। মাছটা দিয়া জলদি বাড়ি যান।'

অমর যেন হঠাৎ জোর হারিয়ে ফেললেন। পা দুটো যেন দশ মণ ভারি হয়ে মাটিতে গেঁথে গেছে।

'কই, আজো তো তোমার ব্যাগে মাছ নেই।'

'নেই? সত্যি নেই?'

boighar.com

'না, মেছো ভূত ধরেছিল?'

'হ্যাঁ।'

রেণু এবার আর হাসলেন না। কেমন এক অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে। সে রাতে প্রচণ্ড জ্বর হল অমরের। ওষুধেও কাজ হল না। প্রায় সারা রাত ছটফট করলেন তিনি। মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে রেণুরও পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। ভোর রাতের দিকে জ্বর একটু কমলে অমর ঘুমালেন।

জামাইয়ের ভীষণ জ্বর খবর পেয়ে পরদিন সন্ধ্যায় শ্বশুর বাড়ি থেকে দেখতে এলেন রেণুর বড় ভাই অনিল। সঙ্গে করে আনলেন একজোড়া বেশ বড় ইলিশ। জামাই মাছ পছন্দ করে, বিশেষ করে ইলিশ মাছ। এটা তারা জানেন। তাছাড়া তাদের ওদিকে ইলিশ বেশ সস্তা।

'ওরে রেণু, দুপুরে জামাইকে সরষেবাটা দিয়ে ইলিশ মাছ দিস। জ্বরের পর ভালো লাগবে।'

'মাছ কই?'

'কেন তোকে দুটো ব্যাগ দিলাম না, তার একটায়...'

'কোনো ব্যাগেই মাছ নেই।'

'কী বলছিস...' হঠাৎ অনিল উঠে দাঁড়ালেন। 'বুঝতে পেরেছি ওই বদমাশটা মাছ দুটো সরিয়েছে। দাঁড়া আমি আসছি।'

'দাঁড়ান দাদা।' অমর উঠে এসে থামাল অনিলকে।

'কী হল?'

'যাবেন না।'

'কেন?'

'আগে বলেন কী হয়েছিল?'

'আমি তোমাদের এখানে আসছিলাম। তখন পথে এক লোক বলল, আপনি অমর বাবুর কাছে যাচ্ছেন?'

'আমি ভাবলাম বোধহয় তোমার পরিচিত, তাই বললাম, হ্যাঁ।'

'তখন লোকটি বলল, উনার খুব জ্বর, উনি তো আপনার মাছ খেতে পারবেন না। মাছ দুটো আমাকে দিয়ে যান।'

'আমি তখন খুব অবাক হলাম– ও জানল কী করে যে আমি ব্যাগে করে দুটো মাছ এনেছি। তারপর অবশ্য ব্যাটাকে একটা ধমক দিয়ে চলে এসেছি। ব্যাটা তখন আমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় হাত সাফাই করে...আজকাল কত রকমের জোচ্চুরি বেরিয়েছে... আমি যাই, ব্যাটা নিশ্চয় এখনো বেশি দূর যেতে পারেনি।'

'না দাদা, যাবেন না। ও সাধারণ কেউ নয়। ভূত! মেছো ভূত!'

'ওহে জ্বরে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দাঁড়াও না বাছাধনকে একটু শিক্ষা দিয়ে আসি।' বলে অনিল দেরি করলেন না। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

অনিলকে খুব বেশি দূর যেতে হল না। নিরিবিলি একটা গাছের গোড়ায় মেছো ভূতকে পেয়ে গেলেন। অনিলকে দেখে সে পরিচিতের হাসি দিল।

'ছার, অমর বাবুর অবস্থা কী?'

'হারামজাদা, আমার মাছ কী করছস?'

'ছিঃ ছার গালি দেন ক্যান?'

অনিল লম্বা চওড়া শক্তিশালী পুরুষ। তিনি তার শার্টের কলার ধরে টেনে দাঁড় করালেন। লোকটিকে মনে হল বেশ বিরক্ত হল।

'অনিল বাবু কাজটা ঠিক করতাছেন না।'

অনিল ভিতরে ভিতরে অবাক হলেন। 'ও আমার নাম জানল কিভাবে?' কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ করলেন না।

'হারামজাদা, আমার মাছ কী করেছিস বল?'

'খায়া ফেলছি।'

'হা কর হামাজাদা। তোর জিভ টেনে ছিঁড়ব।'

'হা আআ।

কালো কুচকুচে সাপের মতো একটা লম্বা জিভ দেখলেন অনিল। লক লক করছে। তার হাত ফসকে পড়ে গেল লোকটা। মেয়েদের মতো খিল খিল করে হেসে উঠল সে। অনিল বাবু প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন, হঠাৎ তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু মনে হল তার পিছু নিয়েছে লোকটা। খিল

boighar.com

খিল করে মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে পিছু নিয়েছে যেন... দৌড়াতে দৌড়াতে টের পেলেন লোকটা নাকি ভূতটা ঠিক দৌড়ে আসছে না, কেমন এক অদ্ভূত উপায়ে উড়ে আসছে... মাথাটা তার ঘাড়ের কাছে। আর হঠাৎ তিনি তার ঘাড়ের কাছে তীব্র একটা কামড় টের পেলেন...কামড় দিয়েছে!! তীব্র একটা ব্যথায় জ্ঞান হারালেন তিনি।

দাহ করার সময় অনিল বাবুর সারা শরীরে অমর দেখতে পেল মাছের মতো আঁশ হয়েছে। কে জানে কেন!

বইঘর.কম

অসম্ভব

সকাল আটটার দিকে দরজা খুলে এমা অবাক। একটা অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের দরজার সামনে। লোক না বলে তরুণ বলাই ভালো হাতে একটা ছোট্ট সুটকেস।

'কী চান?'

'আপনার বাবা আছেন।'

'না।'

'তাহলে আপনার মা?'

'কেন বলুন তো?'

'না মানে আপনার বাসায় একটা বাজে টাইপ ভূত ঢুকেছে। আজ সকালেই ঢুকেছে। ওটাকে তাড়াতে এসেছি। আপনার বাবার বা মার অনুমতি পেলেই...'

'মা, দেখ তো লোকটা কি বলছে।' এমা চিৎকার করে মাকে ডাকল না। মা এলেন।

'কী ব্যাপার?'

তরুণটি হাসি মুখে আগের কথাটিই বলল।

'না মানে আপনাদের বাসায় একটা বাজে টাইপ ভূত আছে। মানে আজ ভোরেই ঢুকেছে। ওটাকে তাড়াতে এসেছি। আপনার অনুমতি পেলেই...'

'ফাজলামো করো?'

'ফাজলামো না...খালাম্মা। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। আমি একজন শখের ভূত গবেষক। বলতে পারেন এটাই আমার পেশা, নেশা... সব। আজ অন্য একটা বাসা থেকে ভূত তাড়াচ্ছিলাম। কিন্তু ভূতটা সুড়ুৎ করে

বের হয়ে আপনাদের বাসায় ঢুকে পড়েছে।'

boighar.com

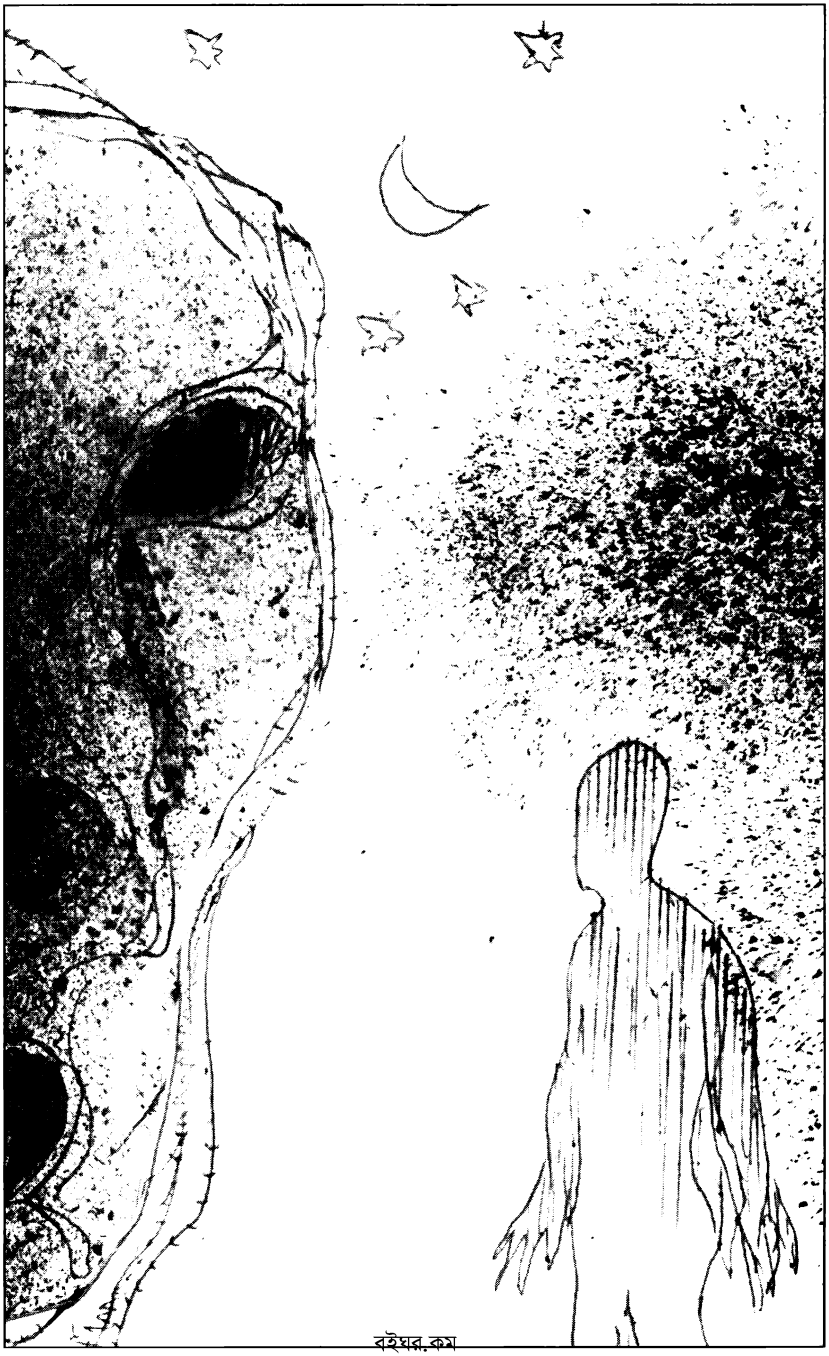

বইঘর.কম

পেছন থেকে হঠাৎ এমা খিল খিল করে হেসে উঠল। সে এতক্ষণ পেটে বহু কষ্টে হাসি আটকে রেখেছিল। আর পারল না। লোকটা নিশ্চয়ই পাগল টাগল হবে কিংবা কোনো ধুরন্দর।

'আপনাদের বোধহয় বিশ্বাস হল না? পিছনে তাকান একটু, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

এমা আর তার মা পিছনে তাকাল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই যেন জমে গেল। তাদের বাসার সমস্ত ছুরি, চামচ, দা, বটি লোহার তৈরি সব জিনিস শূন্যে স্থির হয়ে ভাসছে। একটু একটু দুলছে... যেন তাদের মা মেয়ে দুজনকে পাহারা দিচ্ছে...

'দেখলেন বদমাশটা কত খারাপ। সব ভূত লোহা আর রসুন ভয় পায় অথচ সে লোহা নিয়েই খেলছে।' বলা মাত্রই কোত্থেকে হুড়মুড় করে বৃষ্টির মতো রসুন পড়তে লাগল। এমার দাঁত কপাটি লেগে গেল মাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। এমার মার গলা দিয়ে কোনো কথা সরছিল না। তিনি দু' হাতে এমাকে জড়িয়ে ধরে কোনো মতে শুধু বললেন, 'বাবা,তোমাকে অনুমতি দিলাম, একটা কিছু করো।'

তরুণটি আর কোনো কথা না বলে বাসায় ঢুকে পড়ল এবং ঢুকেই শক্ত করে দরজা লাগিয়ে দিল।

'বুঝতেই পারছেন অবস্থা কত খারাপ। দ্রুত কাজ করতে হবে। সে এখন একা আছে। কিন্তু খুব শীঘ্র সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। এ ভূতের টাইপটা অনেকটা .....একোষী অ্যামিবার মতো।'

সে ঘরে ঢুকে তার বাক্স খুলে গোল মতো একটা যন্ত্র চালু করল। ঝি ঝি পোকার মতো শব্দ হতে লাগল যন্ত্রটা থেকে। যন্ত্রটার উপরে ছোট্ট একটা ফুটো। ফুটোর মধ্যে একটা ছোট্ট লাল আলো জ্বলছে।

'খালাম্মা, খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি হবে?'

'অবশ্যই হবে বাবা, দিচ্ছি।' এমা একটু ধাতস্ত হয়েছে। কিন্তু মার শরীরে সেটে আছে। থর থর করে কাঁপছে। আর এ সময় বাবা নেই। এবার মা ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানি বের করে তরুণটির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। গ্লাস হাতে নিয়ে তরুণটি যন্ত্রটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এমা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, সারা ঘর জুড়ে তাদের বাসার লোহার তৈরি

boighar.com

সব জিনিসপত্র ভাসছে...ঘুরছে...নামছে...উঠছে... জিনিসের সংখ্যা যেন বাড়ছে। মাঝে মাঝে একটার সঙ্গে আরেকটা বাড়ি খেয়ে শব্দ করে উঠছে। কিন্তু কেউ আছড়ে পড়ছে না মাটিতে।

এ সময় দরজা ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। ধাক্কার ধরন দেখে এমা বুঝে গেল বাবা এসেছে। 'বাবা এসেছেন' বলেও ফেলল সে।

'না, আপনার বাবা না। এ ঘরের ভূতটাই অন্য একটা ফর্মে এসেছে। দরজা খুলবেন না।'

'এমা এমা, দরজা খুলছিস না কেন?' বাইরে থেকে বাবার গলা শোনা গেল।

'মা, এ তো বাবার গলা।'

'হ্যাঁ, উনিই তো এসেছেন। দরজা খুলে দেই।'

'আহ্ বল্লাম তো উনি নন। একটু ধৈর্য ধরুন।'

'কী হল তোমাদের, সব কি কালা হয়ে গেছে নাকি?' বাবার বিরক্ত গলা শোনা গেল বাইরে থেকে। আর ঠিক তখনই দেখা গেল। এমার বাবা ঘরের ভিতরে।

'কী ব্যাপার, তোমরা দরজা খুলছিলে না কেন? এ লোকটা কে?'

এমা অবাক হয়ে গেল। হ্যাঁ, তার বাবাই। কিন্তু বাবা ঢুকল কিভাবে? একটু আগেও তো দরজা ধাক্কাচ্ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, সারা ঘরে এই যে লোহা লক্কর ঝুলছে, এসব দেখে বাবা মোটেও অবাক নন। যেন এটাই স্বাভাবিক। অদ্ভুত বাক্সটা নিয়ে মেঝেতে বসা তরুণটিকে দেখেও খুব একটা অবাক হলেন না তিনি। তারপর নেহায়েত কিছু বলতে হয়, এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'এই, এই ছেলে, বের হও, এখনি বের হও।'

ছেলেটি মানে তরুণটি কোনো কথা বলল না। ঠাণ্ডা গ্লাসের পানি এক চুমুক খেল।

'কী হল? কথা কানে যায় না? এই এমা, একটা লাঠি দে তো...'

আর ঠিক তখনি ছেলেটি পানির গ্লাসটি রেখে তার ঝোলা থেকে লম্বা একটা ছোরার মতো বের করল। যার মাথাটা সামান্য একটু বাঁকা। 'আপনারা দুজনেই চোখ বন্ধ করুন', প্রায় ফিস ফিস করে বলল তরুণটি। এমা চোখ বন্ধ করার আগেই দেখল বিদ্যুৎ গতিতে তরুণটি লাফিয়ে উঠে

হাতের অস্ত্রটি তার বাবার পেট বরাবর চালাল...একটা আর্তনাদের শব্দ হল। তারপর ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল। আর ঝন ঝন শব্দে লোহার জিনিসপত্র মেঝেতে পড়তে লাগল। আশ্চর্য! একটাও তাদের গায়ে এসে পড়ল না!

ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল তরুণটি শান্ত ভঙ্গিতে তার জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। সারা ঘরময় লোহার জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো। আর ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল।

'এবার আপনার বাবা এসেছেন। দরজা খুলে দিন।'

এমা আর তার মা দুজনেই ছুটে গেলেন দরজা খুলতে। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে দেখেন কেউ নেই।

'একি, ঘরের এ অবস্থা কেন?'

হতভম্ব মা মেয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ কোনো কথা বলল না। বললেও লাভ হত না। এমার বাবা কঠিন চরিত্রের মানুষ। এসব আজগুবি গল্প কখনো বিশ্বাস করেন না।

boighar.com

মতির মিসটেক

মোতালেব সাহেবের খুব বাজে একটা অভ্যেস, একবার যেটা মাথায় ঢোকে সেটা না করা পর্যন্ত তাঁর অস্থির লাগে। যেমন এখন সেরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে। রাত সাড়ে বারোটায় তার মনে হচ্ছে চুল কাটা দরকার, চুলটা কানের উপর চলে এসেছে। চুল কানের উপর চলে আসলেই তাঁর কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। তিনি ভালো করেই জানেন রাত সাড়ে বারোটায় কোনো সেলুন খোলা থাকবে না। তবু তিনি বেরিয়ে পড়লেন। দেখা যাক, না যদি খোলা পাওয়া যায় কোনো সেলুন।

তিনি একা মানুষ। বিয়ে-থা করেননি বলে, রাত সাড়ে বারোটায় বাসা থেকে বেরুতে গিয়ে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হল না। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুলেন। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষ মাথায় যেখানে বেশ কিছু দোকান পাট আছে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। এই পাড়ায় এসেছেন বছরখানেক হল অথচ কি আশ্চর্য, এই দিকটায় কখনো আসেননি। মফস্বল শহরের আধুনিকতা এখানে এই রাস্তার শেষ মাথায় এসেই আচমকা শেষ হয়েছে যেন। কিছু ঝুপরি টাইপের দোকানপাট এখনো টিকে আছে। তবে সবই বন্ধ। একটা ঝাপ ফেলা দোকানের সামনে বেঞ্চির উপর দুজন লোককে দেখা গেল বিড়ি টানছে। কী ভেবে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করলেন মোতালেব সাহেব, 'আচ্ছা এখানে কোনো সেলুন খোলা পাওয়া যাবে?'

'এত রাইতে সেলুন পাইবেন কই?'

'আছে, মতির সেলুনে যান। হে অনেক রাইত তামাদি খোলা রাখে,' আরেকজন পাশ থেকে বলল।

'মতির সেলুনটা কোথায়?' ভিতরে ভিতরে খুশি হয়ে উঠলেন মোতালেব সাহেব। 'তাহলে পাওয়া গেছে।'

boighar.com

'ঐ যে সামনে বড় বটগাছটার বামদিকে মোড় নিলেই দেখবেন একটা লাল সাইনবোর্ড।'

বটগাছটার কাছে পৌঁছে মোতালেব সাহেবের মনে হল কাজটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। এত রাতে এ রকম একটা জায়গায় চুল কাটাতে আসার কোনো মানে হয় না। তবে লাল সাইনবোর্ডটা তার চোখে পড়ল। সাইনবোর্ডের পাশে টিমটিমে একটা বাল্ব জ্বলছে বলেই বোঝা যাচ্ছে সাইনবোর্ডটা লাল। তাতে আঁকাবাঁকা হাতে লেখা 'মতির সেলুন'। তবে আশ্চর্য, রাত বারোটার সময়ও মতি মিয়া তার সেলুন খোলা রেখেছে। খচ খচ কাচির শব্দে চুল কাটছে মিশিমিশে কালো একটা লোক। সম্ভবত সেই মতি হবে।

'চুল কাটা যাবে?' গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কেন যাইব না? বহেন। উনারটা শেষ কইরাই...'

মোতালেব সাহেব খুশি মনে বসলেন। দোকানের অবস্থা সুবিধার না। ময়লা নোংরা। তা হোক, সেলুন তো, চুল তো কাটানোযাবে। তিনি যে বেঞ্চে বসলেন তার উপর ভাজ করা একটা পেপার। তিন দিনের পুরোনো, সেটাই তুলে নিলেন হাতে।

পেপার পড়তে পড়তে তিনি খেয়াল করলেন মতি চুল কেটে এখন ক্ষুর হাতে লোকটির দাড়ি সেভ করছে। তা করুক মোতালেব সাহেবের তাড়া নেই। কতক্ষণ পেপার পড়েছিলেন কে জানে হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন ঘড়িতে আড়াইটা বাজে। আড়াইটা? এত বেজে গেছে?

মতি লোকটি এতক্ষণ সেভ করতে করতে গুন গুন করে কিছু একটা সুর ভাজছিল। সেটা বন্ধ। উপরে একটা পুরোনো ফ্যান চলছিল,সেটার শব্দও বন্ধ...একেবারে নিঃশব্দ চারদিক। আর তখনই মোতালেব সাহেব আঁতকে উঠলেন। তার পায়ের পাশ দিয়ে একটা সরু সাপের মতো কিছু হেঁটে চলেছে। তিনি পা সরিয়ে নিতে গিয়েই টের পেলেন সাপ নয়, সরু রক্তের একটা ধারা বয়ে চলেছে। রক্ত! রক্তটা কোথা থেকে এল? তিনি রক্তের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখেন সেটা এসেছে তার সামনের চেয়ারের তল থেকে যেখানে বসে আছে লোকটি যাকে মতি ধারাল ক্ষুর দিয়ে সেভ করে দিচ্ছে...তিনি ঝট করে মুখ তুলে তাকালেন মতি নামের নাপিতের দিকে।

মতির হাতের ক্ষুর রক্তে লাল হয়ে আছে। তখনো টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।

'স্যার, একটা মিসটেক হইছে।'

'কী?' কম্পিত গলায় জানতে চান মোতালেব সাহেব। মতি চোখের ইশারায় চেয়ারে বসা লোকটাকে দেখায়। মোতালেব সাহেব তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি দেখেন চেয়ারে বসা লোকটা হা করে আছে। চোখ দুটো খোলা। তার গলাটা নিপুণভাবে দু ফাঁক করে কাটা। সেখান থেকেই রক্ত হোস পাইপের মতো নেমে আসছে। প্রায় নিঃশব্দে।

'স্যার, বেখেয়ালে পোস দিয়া ফেলছি...'

মোতালেব সাহেব প্রচণ্ড ভয় পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেলুন থেকে প্রায় লাফ দিয়ে বাইরে চলে এলেন। তার মনে হল পিছনে তিনি একটা হাসির শব্দ পেলেন। মতিই হেসেছে কিন্তু তার কেন যেন মনে হল গলাকাটা মৃত লোকটিও কি হেসেছে মতির সঙ্গে? দুজন মানুষের হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ছুটতে ছুটতে এসে তিনি সেখানে দাঁড়ালেন যেখানে সেই লোক দুটো তখনো বসে আছে। তাদের হাতে অবশ্য তখন কোনো বিড়ি জ্বলছিল না। তাদের দুজনকে দেখে তিনি যেন সাহস পেলেন। এদেরকে কি বলা উচিৎ ঘটনাটা? একটু আগে মতির দোকানে একটা খুন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মতিই করেছে। তারাই কথা বলে উঠল। তাদের একজন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'কি স্যার, চুল কাটাইলেন না?'

'মতি মতি...' তিনি বলার চেষ্টা করলেন ঘটনাটি। কিন্তু তার আগে তাদের একজন বলে উঠল, 'মতি গলা কাটছে?'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন মোতালেব সাহেব। এরা জানল কিভাবে? আর তখনই তিনি খেয়াল করলেন লোক দুটো তার দিকে মাথা তুলে আঙুল দিয়ে তাদের গলার দিকে দেখাল। তিনি হতভম্ব হয়ে দেখেন তাদের দুজনেরও গলা দুটো কাটা। ঠিক সেলুনের লোকটির মতো করে। মোতালেব সাহেবের মনে হল তার পা দুটো দশ মণ ওজন হয়ে মাটিতে যেন গেঁথে গেছে। তার কী হল– তিনি দশ মণ ওজনের পা নিয়ে আছড়ে পাচড়ে ছুটতে লাগলেন। কতক্ষণ ছুটেছেন তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা রিকশা পেলেন। এত রাতেও রিকশা থাকে।

boighar.com

'এই রিকশা যাবে?'

রিকশাওয়ালা কোনো কথা না বলে উঠার ইঙ্গিত করল। মোতালেব সাহেব প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। পুরো ব্যাপারটা তিনি ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করলেন। এটা কি কোনো খুনের ঘটনা...নাকি...হঠাৎ খেয়াল করলেন তিনি উত্তেজনা বসে রিকশাওয়ালাকে বলেননি কোথায় যেতে হবে কিন্তু রিকশাওয়ালা ঠিক ঠিক তার বাসার সামনে এসে থামল।

'কী করে বুঝলে এটা আমার বাসা?'

রিকশাওয়ালা কথা বলল না। তার গলায় একটু গাঢ় রঙের মাফলার। চুপচুপে ভেজা। সম্ভবত রক্তেই। কেননা তার সাদা গেঞ্জিতেও গলা থেকে লাল রক্তের একটা ধারা তখনো বইছে। মোতালেব সাহেব কোনোমতে গেটেরদরজা ধরে দাঁড়ালেন। রিকশাওয়ালা রিকশা ঘুরিয়ে চলে গেল ভাড়া না নিয়েই। এসব কী হচ্ছে? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? তিনি টলতে টলতে দরজার কাছে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করলেন। তালা খুলতে, যাবেন দেখেন তালা খোলা! তবে কি তিনি ভুল করে তালা না লাগিয়েই বের হয়ে গিয়েছিলেন? এ রকম ভুল তো কখনো হয় না। ঢুকে দেখে ড্রাইংরুমের লাইট জ্বলছে। অবশ্য ড্রইংরুমের লাইট তিনি জ্বালিয়েই গিয়েছিলেন সেরকমই মনে পড়ছে। ঘরে ঢুকে দরজা লাগাতে গিয়ে তিনি জমে গেলেন। সারা শরীরের প্রতিটি লোমকূপ নড়ে উঠল। সোফায় বসে আছে মতি। তার সামনের টেবিলে একটা কাঁচি, চিরুনি আর একটা ক্ষুর! ক্ষুরটা থেকে চিকন একটা রক্তের ধারা কি তার দামী কাচের টেবিলের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসছিল? কে জানে মোতালেব সাহেবের ভুলও হতে পারে। মোতালেব সাহবেকে দেখে মতি দাঁত বের করে হাসল।

'স্যার, চুল না কাটায় আয়া পড়লেন যে?'

মোতালেব সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন। প্রচণ্ড পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। দম আটকে আসছে। তিনি দেখলেন মতি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ক্ষুরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পরদিন মোতালেব সাহেবের বাসার সামনে মানুষের ভিড় দেখা গেল। কে বা কারা মোতালেব সাহেবকে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে গেছে। নিশ্চয়ই কোনো সন্ত্রাসীর কাজ। পাড়ার লোকেরা তাই ভাবল।

বইঘর.কম

আলতাফ সাহেবের বিদায়

আজ তিন বছর ধরে বিছানায় প্যারালাইসড হয়ে পড়ে আছেন আলতাফ সাহেব। বয়সও খুব কম হয়েছে বলা যাবে না। তেহাত্তর পার করেছেন। এখন মৃত্যুই কাম্য। কায়মনোবাক্যে তিনি মৃত্যুকে ডাকেন। মৃত্যু তার ডাকে সাড়া দেয় না... কী জঘন্য এই ধুকে ধুকে বেঁচে থাকা!

আলতাফ সাহেব তাঁর একমাত্র ছেলের কাছে আশ্রিত। ছেলে বড় কর্মকর্তা। সরকারি বাড়ির পিছনের একটা রুমে ফেলে রেখেছে তাঁকে। অবশ্য একটা দয়া করেছে ছেলে, তাঁর জন্য একটা কাজের লোক রেখে দিয়েছেন। লোক না বলে ছেলে বলাই ভাল। ছেলেটি তাঁর খাবার দাবার এনে দেয়। টুকটাক ফাইফরমাশ খাটে। মাঝে মধ্যে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়। তবে ক'দিন ধরে আলতাফ সাহেব লক্ষ্য করেছেন ছেলেটি তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। কথাবার্তাও সেভাবে শুনছে না। কেমন একটা গা-ছাড়া ভাব। অবশ্য ছেলেটাকেই বা দোষ দিয়ে কী হবে। বয়স কম। এই বৃদ্ধের পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ কী তার।

তবে আলতাফ সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন– আজ রাতই হবে এই বাড়িতে তার শেষ রাত। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তিনি আত্মহত্যা করবেন। ইঁদুর মারার বিষের শিশিটা জোগাড় করতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সেটা এখন তার খাটের নিচে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে।

তিনি আর বেশি সময় নিবেন না। এই তো আর মাত্র ঘণ্টাখানেক, তারপর বিদায় এ পৃথিবী থেকে। বহুদিন পর ভালো লাগছে তার। মুক্তির স্বাদ পেতে যাচ্ছেন তিনি। কত কথা মনে পড়ছে– ফেলে আসা জীবনটা, তার স্ত্রী, তার ছেলে। আচ্ছা, তার ছেলেটা এমন বদলে গেল কেন? বুড়ো বাপটার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। মরল কি বাঁচল। হয়ত মাসে একবার

boighar.com

বইঘর কথা

ছেলের মাথাটা দরজার কাছে দেখা যায়।

'বাবা, কী অবস্থা?'

আলতাফ সাহেব বলার চেষ্টা করেন, 'আয় কাছে আয়' গলা দিয়ে ঘর ঘর শব্দ হয়। কথা বলতে পারেন না। ততক্ষণে ছেলে নেই। নাতিটাও আসে না। আসলে ভয় পায়। আর ছেলের বউয়ের কথা বাদই দিলাম। আর ঠিক তখনই তার মনে পড়ে, তার একটা মেয়ে ছিল। কী মিষ্টি মেয়েটা! আর কী আশ্চর্য মাত্র পনের বছর বয়সে তার মেয়েটা হুট করেমরে গেল। ডাক্তারের কাছে নেয়ার সুযোগটা পর্যন্ত দিল না।

আলতাফ সাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার পনের বছরের মেয়েটাকে। তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। আচ্ছা, মেয়েটা যদি বেঁচে থাকত তাহলে এতদিনে তার বিয়ে হত। ফুটফুটে একটা বাচ্চাও হয়ত থাকত। আচ্ছা, তাঁর মেয়ে কি তাঁর ছেলের মতো তাকে এমন অযত্নে অবহেলায় প্রায় অন্ধকার এই পিছনের ঘরে ফেলে রাখত? আলতাফ সাহেব টের পেলেন তার চোখ দুটো ভিজে উঠছে। আর তখনই কাছাকাছি কোথাও ঢং ঢং করে রাত বারোটার ঘণ্টা বেজে উঠল।

আলতাফ সাহেব খুব সাবধানে খাটের নিচ থেকে শিশিটা তুলে নিলেন। ভীষণ কষ্ট হল। একটা মাত্র হাত তার সচল; সেটাকেই কাজে লাগালেন। কী আনন্দ! বিষের শিশি এখন তার হাতে। দাঁতে কামড়ে মুখটা খুলে ফেলতে খুব বেশি কষ্ট হল না। এবার...আলতাফ সাহেব শেষবারের মতো চারদিকে তাকালেন। এই ঘরটা তাকে বড্ড কষ্ট দিয়েছে। দীর্ঘ তিনটি বছর অপমান, গঞ্জনা, কষ্ট আর...আর ভাবতে চান না আলতাফ সাহেব শিশিটা উপুড় করে বোতলটা।

মুহূর্তে চুরমার। কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আলতাফ সাহেব উপরে তাকিয়ে দেখেন– বাকি লাইন উপরে লম্বা তারের মাথায় ঝুলন্ত ষাট পাওয়ারের বাল্বটা দুলছে। সারা ঘরে মিষ্টি একটা গন্ধ! গন্ধটা পরিচিত। কোথায় যেন... কোথায় যেন...আর তখনই আলতাফ সাহেব দেখেন তার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ বিশ বছর আগে মারা যাওয়া তার মেয়ে চামেলি দাঁড়িয়ে আছে। হাসি হাসি মুখ। হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে ধরল তার হাত। যে হাতটা

boighar.com

দিয়ে একটু আগে তিনি বিষের শিশিটা চেপে ধরেছিলেন। আর কী আশ্চর্য, টেনে তুলল বাবাকে। এটা কি সম্ভব!? তিন বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী আলতাফ সাহেব মেয়ের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

'এই ওঠো তো।'

'কী হল?'

'তোমার বাবার ঘরে কিসের শব্দ হল।'

'কী শব্দ?'

'দরজা খোলার শব্দ।'

'আরে ধুর, শোও তো...।'

'না সত্যি।'

জানালার কাছে গেল রুমানা এবং চমকে উঠল।

'ওকি। এই জলদি এসো।'

'কী হল?'

'দেখ দেখ।'

ইমতিয়াজ দ্রুত উঠে এল জানালার কাছে।

'একি! হ্যাঁ একটা লোক লোহার গেট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা তার বাবা। দিব্যি হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে, গেট দিয়ে, এটা কি সম্ভব! একা! একদম একা।

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল ইমতিয়াজ। ছুটে নিচে নেমে এল। দরজা খুলে গেটের কাছে ছুটে গেল। গেটটা হা করে খোলা...এই তো বাবা হেঁটে যাচ্ছেন একা একা। 'বাবা!' আবার চেঁচাল ইমতিয়াজ। বাবা ফিরে তাকালেন না, যেন শুনতেই পেলেন না। ঋজু পায়ে হেঁটে চলেছেন সামনের দিকে। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে। তিনি তো জানেন, হাত ধরে আছে তার মেয়ে, তার প্রিয় মেয়ে চামেলি।

মুন্নি

বড় বোন আর দুলাভাই গেছে কক্সবাজার বেড়াতে। আমাকে রেখে গেছে বাড়ি পাহারায়। অবশ্য আমার জন্য এটা বেশ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। একা একা থাকি। খাই হোটেলে আর সারা দিন গল্পের বই পড়ি। নিজেদের বাসায় আমার পিতৃদেব আউট বই ঢুকতে দেয় না ঘরে। কিন্তু বোনের বাসায় এসে তার শোধ তুলছি। বোন-দুলাভাই দু'জনই বইয়ের পোকা। ঘরে ভর্তি শুধু বই বই আর বই। জীম করবেটের কুমায়ুনের 'মানুষখেকো বাঘ' শেষ করলাম, তারপর ধরলাম বিভূতিভূষণের 'মন ময়ূরী' বিরাট মোটা বই। সেটাও শেষ করে এবার ধরেছি শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বক্সি অমনিবাস।

দিনের বেলাটাও এ এলাকাটা অসম্ভব নীরব। চারদিকে এখনো ফাঁকা ফাঁকা। বাড়ি-ঘর খুব একটা ওঠেনি। এখনো এতটা শহুরে হয়ে ওঠেনি এলাকাটা। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে মানে, যাকে বলে হোটেল থেকে খেয়ে এসে সবে মাত্র একটা বই নিয়ে বসেছি, হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক শব্দ! এই সময় কে এলো। দরজা না খুলে আগে জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। আপা সেরকমই বলে গিয়েছিল– হুট করে দরজা খুলবি না, আগে জানালা দিয়ে দেখে নিবি কে এল।

'কে?'

'আমি।' চেয়ে দেখি ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে।

'তুমি কে?'

'আমি।'

'আমি তো বুঝলাম কিন্তু এই আমিটা কে?'

'আমি মুন্নি।'

'কী চাও?'

boighar.com

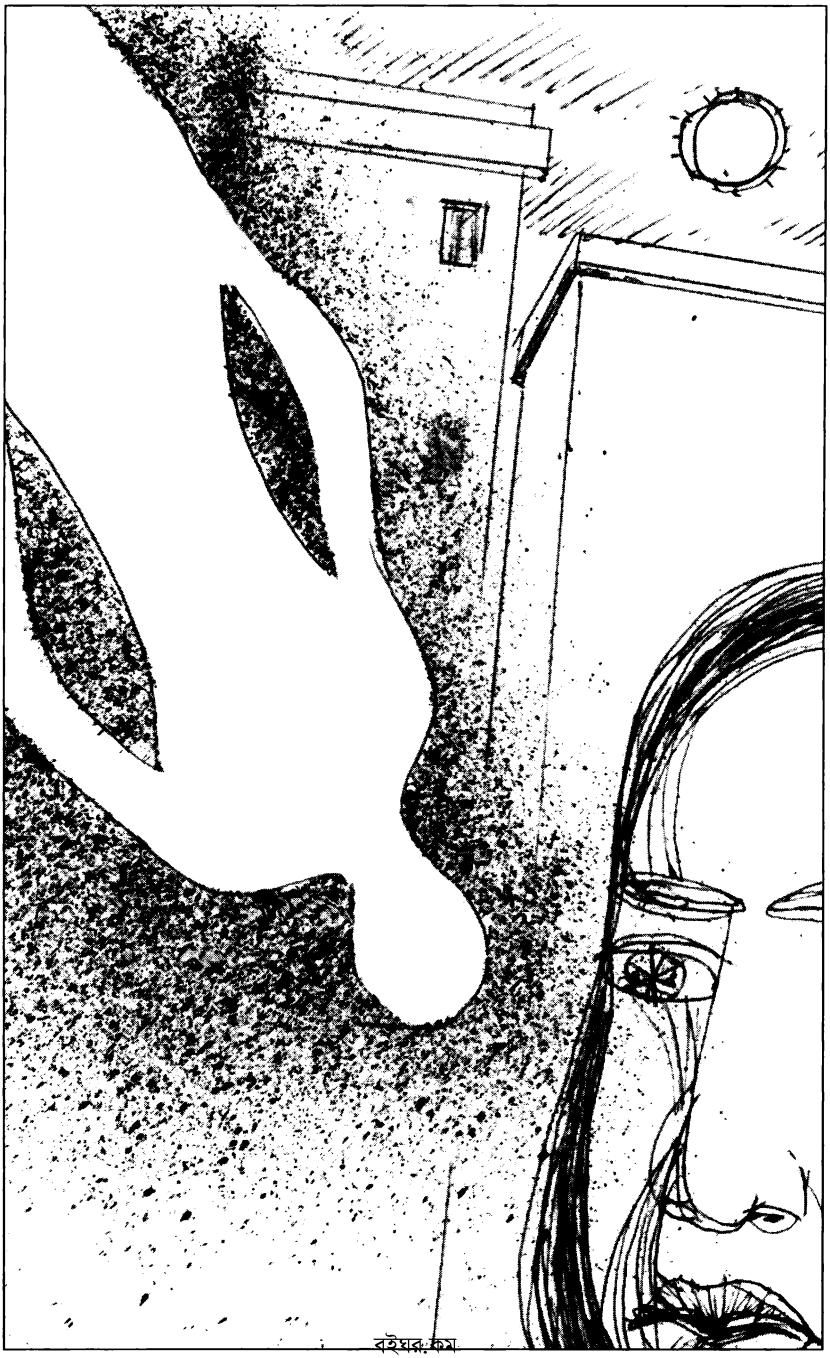

বইঘর.কম

'দরজাটা খুলুন না!'

'কেন, বাসায় তো কেউ নেই...ওরা বেড়াতে গেছে।'

আমি ভাবলাম বোধ হয় আমার ভাগ্নির কোনোবান্ধবী হবে।

'না, দরজা খুলুন।' সে নাছোড়বান্দা। দরজা খুললতেই হবে। আমি দরজাটা খুলে দিলাম। মেয়েটা হুট করে বাসায় ঢুকে বাসার পেছন দিকে ছুটে গেল। তখন আমার ধারণা হল মেয়েটি আশেপাশের কোনো বাসায় বোধ হয় থাকে। হয়ত কিছু পড়েছে টড়েছে তাদের বাসা থেকে, তাই নিতে এসেছে। আপার বাসার পিছনে বেশ জায়গা আছে। তবে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। পেছন দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে, সেটা উঠে গেছে প্রথমে দোতলায়, তারপর দোতলার ছাদে।

আমি আবার বই নিয়ে বসলাম। মেয়েটা বেরিয়ে গেলে দরজা লাগিয়ে দিলেই হবে। দু-এক পাতা পড়েছি মাত্র, হঠাৎ মনে হল মেয়েটা বেরুচ্ছে না কেন? ভয় হল মেয়েটি ছাদে উঠে যায় নি তো? ধ্বক করে উঠল বুকটা। তাই তো এ বাসার ছাদে রেলিং আছে কিন্তু খুবই নিচু। আমি ছুটে বের হলাম। প্রথমে পেছনের বারান্দায় তাকে খুঁজলাম। 'মুন্নি' 'মুন্নি' করে ডাকলামও। কোনো সাড়া নেই। সিঁড়ি দিয়ে ছুটে গেলাম দোতলায়। কেউ নেই। এবার তর তর করে উঠে গেলাম ছাদে। নেই! নেই! ছাদ একদম ফাঁকা। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, মেয়েটা গেল কই? আবার নিচে ছুটে এলাম, আতিপাতি করে খুঁজলাম। নেই! আবার ছুটে গেলাম ছাদে। ধ্বক্ করে উঠল বুকটা। 'মুন্নি!' মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে। রেলিং-এর উপর স্থির হয়ে। মাথা দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। তার ফর্সা কপাল বেয়ে লাল একটা রক্তের ধারা নেমে আসছে। তারপরও দু'হাত ভাজ করে শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে।

'মুন্নি, তোমার কী হয়েছে?' আমি ছুটে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়লাম। মুন্নি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা সঙ্কীর্ণ একটা রেলিং। একটা বাচ্চা মেয়ের দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। যেন ধ্যান করছে এই তপ্ত দুপুরে ছাদে দাঁড়িয়ে...

আমার মাথার ভিতর কী যেন হল। মনে হল মেয়েটাকে বাঁচানো দরকার। মেয়েটা দোতলার ছাদ থেকে পড়ে যেতে পারে যেকোনো

boighar.com

মুহূর্তে...ছুটে গেলাম ওকে ধরতে। আর কী আশ্চর্য, মাথায় রক্ত নিয়ে সে খিল খিল করে হাসতে হাসতে রেলিং-এর উপর দিয়ে দিব্যি ছুটে গেল আরেক দিকে। যেন আমাকে ধরা দেবে না। ভয়ে আমার আত্মা জমে গেল। কুলকুল করে ঘামছিলাম। একই সঙ্গে ভয়, টেনশন আর গণগণে দুপুরের রোদ তো আছেই।

তারপর হঠাৎ করেই দেখি মুন্নি আর নেই। তবে কি পড়েই গেল। আমি ছাদ থেকে নিচে তাকালাম। নেই কেউ নেই। ছুটে নিচে এসে বাড়ির চারদিকে চক্কর লাগালাম। নেই তো নেই। তবে কী পড়েই গেল। আমি ছাদ থেকে নিচে তাকালাম। নেই কেউ নেই। ছুটে নিচে এসে বাড়ির চারদিকে চক্কর লাগালাম। নেই তো কেউ নেই।একদম লাপাত্তা।

সে রাতে আর ঘুমাতে পারলাম না। কোনোমতে রাতটা পার করলাম। পরদিন ভোরেই আপাদুলাভাই এসে হাজির। তাদেরকে তাদের বাড়ি বুঝিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে এক ফাঁকে আপনার কাছে জানতে চাইলাম।

'আপা মুন্নি কে? চেন?'

আপা, কিছু না বলে দুলাভাইয়ের দিকে তাকাল। দুলাভাইও কিছু বলল না, তাকাল আপার দিকে। যেন এ বিষয়ে কিছু বলা নিষেধ। আমিও আর ঘাঁটালাম না, বাড়ি ছুটলাম।

পরে শুনেছি আপারা কেনার আগে ঐ বাড়িতে যারা থাকত তাদের একটি মেয়ে ঐরকম দুপুরবেলা ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়।*

একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

লাজুক ভূত

পাঁচ বছরের পল্টুর কি যে বদ অভ্যাস হয়েছে। তার ছোট চাচার কাছে শুয়ে রাতে ভূতের গল্প না শুনলে ঘুমই আসে না। এটা এখন তার রুটিন হয়ে গেছে যেন। আজও যথারীতি রাত দশটায় এসে হাজির তার ছোট্ট কোল বালিশটা নিয়ে।

'কিরে এসে গেছিস?'

'হুঁম্। বল।'

'আজ একটা হাসির গল্প বলি?'

'না, ভূতের গল্প।'

'ওফ ভূতের গল্পের সব স্টক তো শেষ। আচ্ছা দাঁড়া চিন্তা করি।'

'না, ভূতের গল্প বল।'

'ওফ একটু ভাবতেও দিবি না? কত আর বানানো যায়?

'না, ভূতের গল্প বল।'

'আচ্ছা আচ্ছা শোন তাহলে...'

ছোট চাচা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র রবীন চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে শুরু করল– 'বুঝলি এক ধরনের ভূত আছে, যার নাম হচ্ছে লাজুক ভূত...'

'এই ভূত দেখতে কেমন?'

'এ ভূতটা দেখতে বিশাল...ধর এই ঘরটার ছাদে মাথা ঠেকবে যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দেখতে একদম মানুষের মতোই কিন্তু মাথাটা ছোট্ট।'

'কত ছোট্ট?'

'এই ধর তোর মাথাটার মতো।'

'এই ভূত কী করে?'

boighar.com

বইঘর.কম

'এই ভূতটা বড় অদ্ভুত। অনেক রাতে মানুষের ঘরে চুপি চুপি ঢোকে। তারপর করে কী আস্তে করে মশারী তুলে ঘুমানো মানুষের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ হয়তো মানুষটার ঘুম ভাঙল... চোখাচোখি হল মানুষে আর ভূতে, তখন ফিক করে একটা লাজুক হাসি দিয়েমশারী ফেলে পালিয়ে যায়।'

'তাহলে তো সে ভালো ভূত, কিছু করে না।'

'তুই কী বলছিস? ভেবে দেখ রাতের বেলা তুই একা একা শুয়ে আছিস আর তখন বিশাল একটা কালো কুচকুচে মানুষ ঢুকল যার পা দুটো বিড়ালের মতো... মাথাটা ছোট্ট... মশারী তুলে তোর দিকে তাকাল... ফিক করে হাসল... ভয়ে তোর বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে না?'

'ছোট চাচা, হিম মানে কী?'

'ওফ ওকে এখন হিম মানে বোঝাও...'

'কি শেষ হল তোমাদের ভূতের গল্প?'

পল্টুর মা ঢুকে দেখেন পল্টু তো বটেই তার ছোট চাচাও হা করে ঘুমুচ্ছে। সাধারণত পল্টুই ঘুমিয়ে পড়ে আগে। ছোট দেওর রবীন জেগে থেকে হাত দেখার বই পড়ে। সে অবশ্য ভালো পামিস্ট।

আজ দেখি দুজনেই একসঙ্গে ঘুমাচ্ছে। পাশে যথারীতি একটা হাত দেখার বই খোলা। তিনি খুব সাবধানে রবীনের পাশ থেকে ঘুমন্ত পল্টুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় রবীনের ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। রাতও খুব কম হয়নি।

বিশ্রী একটা গন্ধে রবীনের ঘুমটা ভেঙে গেল। বোধহয় ইঁদুর মরেছে কোথাও তার গন্ধ! নতুন এক উপদ্রব শুরু হয়েছে, কোত্থেকে একটা বিড়াল এসেছে বাসায়, প্রায়ই ইঁদুর না হলে চিকা মেরে ফেলে রাখে। বোধহয় তারই গন্ধ! নাকি বিড়াল ইয়ে করেছে... বেড সুইচটা খুঁজতে হাত বাড়াল রবীন। সুইচটা মশারীর বাইরে কিন্তু হাতটা যেখানে ঠেকল সেটা লোমশ একটা পা বেশ বড়সড় কিন্তু নরম। প্রথমটায় কাঁচা ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারল না রবীন, তারপরই ধ্বক করে উঠল বুকটা। তার বিছানার পাশে কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দাঁড়ান দুটো লোমশ পা, একটু যেন বাঁকানো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যার উপর তার হাত পড়ছে।

boighar.com

অন্ধকার বলে বোঝা যাচ্ছে না...কিন্তু আস্তে আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল... পা দুটো বিড়ালের পায়ের মতো কিন্তু শরীরটা মানুষের...বিশাল....মাথাটা ছোট্ট... যেন পল্টুর মাথাটা! চুলহীন।

রবীন খেয়াল করল মাথাটা নিচু হচ্ছে...নিচু হচ্ছে...একটা হাত...বিশাল লোমশ একটা হাত মশারীটার একটা প্রান্ত আলগোছে ধরে তুলে... আস্তে করে মাথাটা ঢুকাল... চোখ দুটো সবুজ কিন্তু অন্ধকারেও ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করছে...

রবীনের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা চলে এসেছে গলার কাছে। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে...আর তখনই ফিক করে হাসল দানবটা। ধবধবে একপাটি দাঁত দেখর রবীন এক পলকের জন্য! তবে দাঁতগুলো লম্বা নয়, ছোট ছোট কিন্তু সুঁচালো। আবার ঝকঝকে পরিষ্কার! নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল রবীন।

ঠিক কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল রবীনের সে নিজেও জানে না। তবে বাইরে তখন পাড়ার মসজিদে আজান হচ্ছিল। পাখিদের কিচিরমিচির একটু আধটু শোনা যাচ্ছিল। লাফিয়ে উঠে লাইট জ্বালাল রবীন। বিশ্রী গন্ধটা আর নেই। খুব সাবধানে বিছানার কাছে মেঝেতে তাকাল রবীন।

সাদা ঝকঝকে মোজাইক করা মেঝেতে বিশাল এক জোড়া বিড়ালের পায়ের ছাপ পাশাপাশি...রাতে বাইরে বৃষ্টি হয়েছে, কাদা পানিতে মাখানো তারই একজোড়া সুন্দর পায়ের ছাপ। যেন দু পেয়ে কোনো বাঘ এসে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরে! কি মনে হল তার ফ্রেড গেটিংস-এর লেখা 'পামিস্ট্রি দ্যা অকাল্ট মিস্ট্রি' বইটা হাতে তুলে নিল রবীন। সেখানে কয়েকটা লাইন লাল কালিতে আণ্ডার লাইন করা, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় অনেকটা এমন.... 'শনির ক্ষেত্র থেকে নেমে আসা কোনো রেখা যদি শির রেখার উপর কোনো রহস্যময় ত্রিভুজ তৈরি করে তবে কখনো কখনো সেই জাতকের কল্পনা বিপজ্জনকভাবে সত্যি হয়ে ওঠে...'

রবীন নিজের ডান হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরে। তার শনিরক্ষেত্রে থেকে খুব সূক্ষ্ম একটা রেখা নেমে এসেছে, হৃদয়রেখা অতিক্রম করে এই রেখা সরাসরি নেমে এসেছে শিরো রেখায়... তৈরি করেছে একটা ছোট্ট রহস্যময় পিরামিড।

জ্বীন

বাড়িটা যেখানে তার আশেপাশে আর কোনো বাড়ি নেই। তবে বাড়িটা গ্রামের আর দশটা বাড়ির মতোই বিশেষত্বহীন। মূল বাড়ির উপর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে ঝুঁকে আছে একটা বিশাল ঝাকড়া রেইনট্রি গাছ। এই গাছটাতে তিনি থাকেন।

'উনি কি এখনো আছেন?'

'জ্বি আছেন।'

'তার খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা?'

'ঠাট্টা করব কেন? শুনেছি উনি মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন। তাই এক কেজি মিষ্টি নিয়ে এসেছি উনার জন্য।'

'সন্ধ্যা লাগুক। খাওয়া খাদ্য তিনি সন্ধ্যার সময়টায় নেন।'

''সন্ধ্যা... নিজের হাতে দিতে চাই।'

'দিয়েন, নিজের হাতেই দিয়েন।'

'কিভাবে হবে ব্যাপারটা?'

'এই ধরেন সন্ধ্যার সময়ে গাছের নিচে খাড়ায় হাত উঁচা কইরা মিষ্টি ধরবেন, দেখবেন আচমকা আপনার হাত থাইকা মিষ্টি গায়েব হয়া যাইব। তবে একটা কথা...'

'কী?'

'ঐ সময় কিন্তু চোখ বন্ধ রাখবেন।'

'কেন?'

'না রাখলে আপনার বিপদ হইব...ভয় পাইবেন...'

'কী রকম বিপদ?'

'এই ধরেন পাশের গ্রামের সিদ্দিক বিরানী দেয়ার সময় চায়া ছিল। তার চোখ দুইটা আন্ধা হয়া গেছে।'

boighar.com

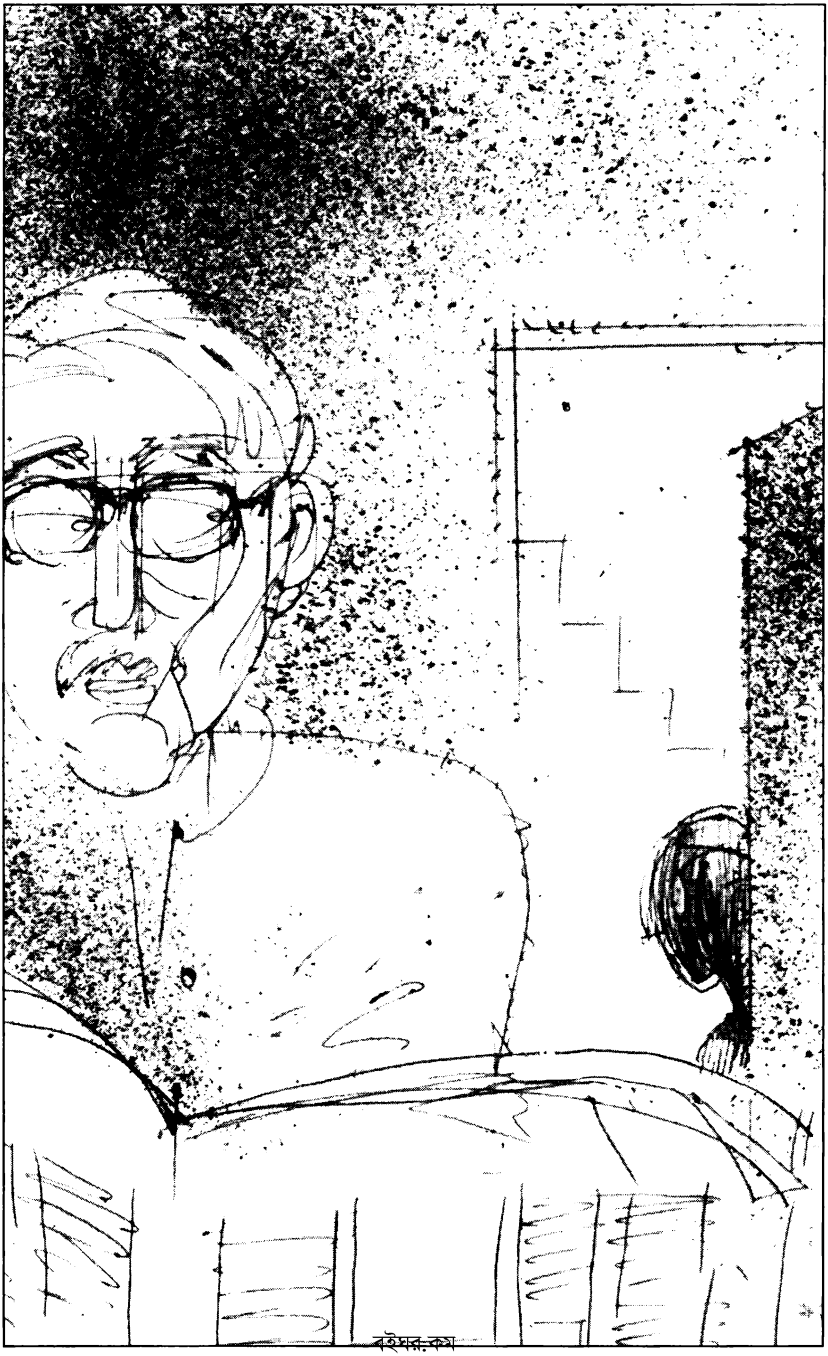

'ও উনি তাহলে বিরানীও খান?'

'জ্বি সবই খান। তবে মিষ্টিডা বেশি পছন্দ করেন।'

'হুঁম।' মাহমুদ তখন মনে মনে প্ল্যান করে ফেলে। সে তাকিয়ে থাকবে মিষ্টি দেয়ার সময়। এবং যিনি (অবশ্যই মানুষ) গাছে বসে মিষ্টি গায়েব করবেন তাকে হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নামাবে। তারপর ইনশাল্লাহ কিল একটাও মাটিতে পড়বে না। মাহমুদ এ ধরনের কেস অনেকগুলো ধরেছে। সাকসেসফুল হলে এটা হবে তার আট নম্বর কেস।

সন্ধ্যার দিকে জ্বীনের মালিকের নির্দেশ মতো মিষ্টির প্যাকেট হাতে এগিয়ে গেল মাহমুদ। তারপর ডান হাতে মিষ্টির প্যাকেট উঁচু করে ধরে চোখ বন্ধ করে (এক চোখ অল্প খুলে) দাঁড়িয়ে রইল মাহমুদ। কিছুক্ষণ পরই মাহমুদ টের পেল গাছের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ।

গাছ বেয়ে কেউ নেমে আসছে। মাহমুদ স্পষ্ট দেখল এই অন্ধকারেও একজন মানুষ সম্ভবত মালকোচা মারা। নেমে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিল মিষ্টির প্যাকেটটা ধরতে... মাহমুদও প্রস্তু ছিল। মিষ্টির প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল গাছের মালকোচা মারা লোকটার হাত...তারপরই হেঁচকা টান দিয়ে একদম মাটিতে।

সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটল মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে। অপ্রস্তুত মালকোচা মারা তরুণটি আছড়ে পড়ল মাটিতে। এগিয়ে এল জ্বীনের মালিক। আশ্চর্যের ব্যাপার এ ঘটনায় সে মোটেই বিচলিত হল না। শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বলল, 'কাজটা ভালো করলেন না।'

'কাজ ভালো কি মন্দ এখনই বুঝবা।' পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে জোরে ফুঁ দিল মাহমুদ। এতক্ষণ সে একাই ছিল, বাঁশির শব্দে হুড়মুড় করে আরো তিনজন তরুণ কোত্থেকে ছুটে এল। এরা সব মাহমুদের নিজের লোক। মানে মাহমুদের বন্ধু। প্ল্যান অনুযায়ী বাইরে লুকিয়ে ছিল। সময় মতো বেরিয়ে এসেছে।

'ঐ তোরা বান দুইটারে।' ততক্ষণে মাটিতে আছড়ে পড়া তরুণটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। সেও খুব ভীত বলে মনে হল না। যেন এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অনেকেই তাকে গাছ থেকে টেনে হিচড়ে নামায়। সে উঠে গা হাত পা ঝেড়ে বলে উঠল, 'ভাইয়েরা, ঝামেলা কইরেন না, যান গা, বিপদ হইব কিন্তু আপনাগো।'

boighar.com

তখনই মাহমুদ ঠাস করে চড় কষাল ওর গায়ে। চড় খেয়ে মালাকোচা মারা তরুণটি গালে হাত দিয়ে তাকাল জ্বীনের মালিকের দিকে।

'কিছু একটা করেন ওস্তাদ। এমনে মাইর খামু? আমেলজনরে .....বাকি লাইন ডাকেন।'

'আপনারা চইলা যান।' শান্ত স্বরে বলে জ্বীনের মালিক। মাহমুদ মারমুখি হয়ে এগিয়ে এসে এবার চড় কষায় নকল জ্বীনের মালিককে। শক্ত হাতের চড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় লোকটি, ওঠে না, ওভাবেই বসে থাকে। ওই অবস্থায় মাহমুদ একটা প্রচণ্ড লাথি কষায় লোকটির পাছায়। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে–

'হারামজাদা ভণ্ড, তোরে সাবধান কইরা দিলাম, এরপর আর যদি খবর পাই জ্বীন-ভূত নিয়া ব্যবসা ফাঁদছস...তাইলে সোজা থানায় দিমু। এই বারের মতো ছাইড়া দিলাম। চলরে মকবুল।' বলে সে তার দল নিয়ে হাঁটা দিল। আজকের মতো অপারেশন সাকসেসফুল।

'তোগো কইছিলাম না কেস ভুয়া।' হাঁটতে হাঁটতে বলে মাহমুদ।

সাফল্যের আনন্দে মাহমুদ সিগারেট ধরায়।

'দুইডারে ধইরা থানায় দিলে হইত না?' মাহমুদের বন্ধু মকবুল বলে।

'আবার থানা পুলিশ। বাঘে ছুইলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুইলে ছত্রিশ ঘা। দরকার কী? যে লাথি দিছি, পাছার ব্যথা থাকব শালার তিনদিন।'

'আর ভূতে ছুইলে কয় ঘা রে?' রফিক জানতে চায়।

'এই দাঁড়া।' তিনজনই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশ। গ্রামের নিরিবিলি নিঝুম সরু রাস্তা। পরিষ্কার আকাশে এক খণ্ড চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় তিনজন দেখল রাস্তার উপর আড়াআড়ি একটা বাঁশ পড়ে আছে। 'এ বাঁশটা কোত্থেকে এল? এতবড় বাঁশ তো এই এলাকায় দেখি নাই।' ফিস ফিস করে বলল মকবুল। 'আসার সময় তো ছিল না।'

'তোরা খামাকা ডরাস। কেউ দুষ্টামি কইরা রাখছে।'

'এখানে দুষ্টামি করব কেডা?'

'আর আমাগো লগে দুষ্টামি করব এমন বুকের পাডা কার আছে ক?'

'এই খাড়া, এইডা টপকাইলে অসুবিধা আছে। যাইতে হইব নিচ দিয়া।' মকবুল বলে।

'তোরা নিচ দিয়া যা, আমি যামু উপর দিয়া।' শক্ত গলায় বলে মাহমুদ। অন্য তিন বন্ধু ঠিকই নিচ দিয়েই গেল। এবার মাহমুদ এগিয়ে গেল। বাঁশটা কোমর সমান উঁচু হয়ে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। নিচ দিয়ে সহজেই যাওয়া যায়। উপর দিয়ে যেতে হলে বাঁশটা ধরে লাফ দিতে হবে। সেটা করতে যেতেই কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হল মাহমুদের। যেন কেউ সমস্ত ব্যাপারটা দেখছে।

মাহমুদ লাফ দেয়ার জন্য একটা হাত রাখল বাঁশটার উপর। বাঁশটা ঠাণ্ডা। আর তখনই হঠাৎ একটা অস্পষ্ট হাসির শব্দ হল বাম দিকে। ঝট করে তাকাল মাহমুদ। নকল জ্বিনের মালিক দাঁড়িয়ে। সে এল কী করে? নিশ্চয় কোনো শর্টকাট রাস্তা আছে। সেই একই পোশাকে, লম্বা সাদা পাঞ্জাবি গায়ে, ছুচালো দাড়ি নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। মাথায় একটা গোল টুপি। মাহমুদ খেয়াল করল লোকটার ভুরু দুইটা পুরু আর ঘন, এই অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে। আগে কি খেয়াল করে নি? লোকটাও মাহমুদের মতো একটা হাত দিয়ে রেখেছে বাঁশটার উপর। লোকটা কথা বলে উঠল।

'মাহমুদ সাহেব, লাফ দেন।'

মাহমুদের মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে, তার মানে, নিশ্চয়ই লোকটা প্রতিশোধ নিতে কোনো ফন্দি করে পিছু নিয়েছে তাদের। কিন্তু লোকটা তার নাম জানল কিভাবে? সে তাকাল তার বন্ধুদের দিকে। তারা তিনজন দাঁড়িয়ে। তারাও হাসছে। ওদের হাসিটা যেন কেমন।

'কিরে মাহমুদ, লাফ দে।' তারাও ওপাশ থেকে চেঁচায়।

'লাফ দেন মাহমুদ সাহেব, লাফ দেন...সময় খুব কম...জলদি লাফ দেন।'

মাহমুদের হঠাৎ মনে হল, তার তিন বন্ধু আর ঐ লোকটা যেন একই দলের। সে আরেকটা হাত রাখল বাঁশের উপর। বাঁশটাকে এখন আর তত ঠাণ্ডা লাগছে না। বরং মনে হচ্ছে বেশ গরম। যেন গরম কিছু বয়ে চলেছে বাঁশটার ভিতরে দিয়ে। বাঁশটার ভিতরটা কি আগাগোড়া...

'কী হল মাহমুদ? লাফ দে।'

'লাফ দেন, মাহমুদ সাহেব লাফ দেন।'

boighar.com

মাহমুদ লাফ দিল। 'দু'হাত বাঁশটাকে শক্ত করে ধরে পা দুটো উঠিয়ে নিল একসঙ্গে উপরের দিকে...অনেকটা অলিম্পিকের পোলভোল্ট দেয়ার মতো। যেন বাঁশটা পোলভোল্টের সেই লাঠি।

'উনি কী এখনো আছেন?'

'আছেন।'

'উনি কী সেই আগের জনই?'

'জ্বি না, উনি আরেকজন।'

'এক কেজি মিষ্টি আনছিলাম। নিজের হাতে দিতে চাই উনারে।'

'দেন, কোনো অসুবিধা নাই, খালি দেয়ার সময় চোখটা বন্ধ রাখবেন।'

'জ্বি রাখব।'

'ভয় নাই যান।'

লোকটা এগিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এই জ্বীনকে নিজের হাতে মিষ্টি দিলে বিপদ আপদ কেটে যায়। এই এলাকায় জনশ্রুতি আছে। সে জ্বীনের মালিকের কথা মতো মিষ্টির প্যাকেটটা এক হাতে উঁচু করে চোখ বন্ধ করল। বুকটা ধ্বক ধ্বককরছে। রেইনট্রি গাছের ডালে একটা সর সর শব্দ হল। কেউ কি ডাল বেয়ে নেমে আসছে। হঠাৎ একটা চোখ যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই একটু খুলে গেল লোকটার। সে দেখতে পেল কেউ একজন লম্বা হাত বাড়িয়ে তার বাড়িয়ে ধরা মিষ্টির প্যাকেটটা নিচ্ছে... লোকটার মুখটা চাঁদের আলোয় এক ঝলক দেখে চেনা চেনা লাগল। মাহমুদ না? বছর খানেক আগে তিন বন্ধুসহ নিখোঁজ হয়েছিল! কে জানে তার ভুলও হতে পারে।

খাটিয়া

রাত আটটার দিকে হুড়মুড় করে বৃষ্টি শুরু হল সঙ্গে প্রবল বাতাস। রকিব ফোন করলেন তাঁর স্ত্রীকে।

'শোনো, তোমরা আজ আর এসো না, এদিকে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে।'

'তাই নাকি? এদিকে তো এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই...ঠিক আছে কাল ন'টার দিকে চলে আসব। সারা'র সঙ্গে কথা বলবে?'

'দাও।'

রকিব শুনতে পেলেন তার স্ত্রী সারাকে ডাকছে। সারা চেঁচিয়ে কী বলল সেটাও অস্পষ্ট শোনা গেল, ঠিকমতো বুঝতে পারল না।

'হ্যালো, শোনো, ও কথা বলবে না, নানুর কাছে গল্প শুনছে।'

'ঠিক আছে।' ফোন রেখে রকিব বিছানায় শুয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিলেন। এই মেঘলা রাতে বরং একটা রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস পড়ে সময়টা কাটানো যাক। ক্ষিধে নেই, আজ রাতে না খেলেও চলবে মনে হচ্ছে।

কিন্তু একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রকিবের। দরজায় কেউ প্রবল শব্দে কড়া নাড়ছে। বই পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন টেরই পাননি রকিব। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। তখনো প্রবল বর্ষণ হচ্ছে তবে বাতাসের ঝাপটাটা নেই। রকিব উঠে গেলেন দরজা খুলতে। দরজা খুলে অবাক হলেন রকিব। চারজন তরুণ কাঁধে একটা লাশের খাটিয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। চারজনেরই মাথায় টুপি, থুতনীতে দাড়ি। চার জনই বৃষ্টিতে ভিজে চুপ চুপ।

'রকিব ভাই আমি আমিন।' চাজনের একজনকে চিনতে পারলেন রকিব। খুব সম্ভব মাদ্রাসার ছাত্র। কিভাবে কিভাবে যেন ছেলেটার মুখ চেনা। 'কি ব্যাপার?'

boighar.com

'একটু মুশকিলে পড়ছি, একজনকে দাফন করে এলাম এই মাত্র। খাটিয়াটা মসজিদে রেখে আসতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বৃষ্টির জন্যে ওদিকে যাওয়া যাচ্ছে না... ভীষণ বৃষ্টি মাটির রাস্তা তো।'

'তো আমি কি করতে পারি?'

'খাটিয়াটা আপনার ঘরে একটু রেখে যেতে দেন যদি, সকালে নিয়ে যেতাম, কাঠের খাটিয়া তো বৃষ্টিতে ভিজলে নষ্ট হয়ে যাবে।'

রকিব একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। আবার বৃষ্টিতে চারজনকে ভিজতে দেখে মায়াও লাগল তার।

'ঠিক আছে রেখে যাও।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

ড্রইং রুমের একদিকের দেয়ালে খাটিয়াটা খাড়া করে হেলান দিয়ে রেখে ওরা আবার ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। বলল কাল খুব ভোরে এসেই নিয়ে যাবে।

ফ্রিজ থেকে একটা আপেল বের করে খেলেন রকিব। তাতেই যেন পেটটা ভরে গেল। চা খেলে ভালো হত কিন্তু আলস্য লাগল।একটা সিগারেট ধরালেন। ঘড়িতে তখন বারোটা বিশ। তখনই ধপ করে একটা শব্দ হল। কিসের শব্দ? শব্দটা কি ড্রইং রুম থেকেই আসল? রকিব অস্বস্তি নিয়ে ড্রইং রুমে গেলেন। লাইট জ্বাললেন, ধ্বক করে উঠল বুকটা। খাটিয়াটা খাড়া করে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। এখন সেটা মেঝেতে শোয়ানো। খাটিয়া সাধারণত যেভাবে থাকে। তবে কি বাতাসে আছড়ে পড়ল? কিন্তু বাতাস আসবে কোত্থেকে? জানালা সবগুলো বন্ধ। তাছাড়া বাইরে এখন শুধু বৃষ্টি হচ্ছে বাতাস তো নেই। হতে পারে ওরা রাখার সময় কোনো গোলমাল করেছিল, পিছলে পড়ে গেছে।

রকিব জোর করে মাথা থেকে খাটিয়ার চিন্তাটা বের করে দিলেন। নিজের ঘরে এসে, কী মনে করে দরজাটা লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন। উপন্যাসটা শেষ করা যাক। কতক্ষণ পড়লেন কে জানে হঠাৎ কেমন একটা ঘষটানো ধরনের শব্দ পেলেন। কিছু একটা টেনে আনার শব্দ। রকিব উঠলেন। দরজা খুলে ঘরের সবগুলো লাইট জ্বালালেন। ড্রইং রুমে যাওয়ার প্যাসেজের লাইটটা জ্বালানো মাত্র হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। খাটিয়াটা ঠিক প্যাসেজের মাঝখানে। ওখানে এল কিভাবে? কেউ টেনে কিংবা ঠেলে এনেছে।পড়ে যাওয়াটার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে– হয়তো

boighar.com

কোনোভাবে পড়ে গেছে কিন্তু এখানে আসবে কিভাবে? রকিব টের পেলেন তিনি ভয় পেয়েছেন।

গলার কাছটা খটখটে শুকনো লাগছে। পানি খাওয়া দরকার। সবগুলো লাইট জ্বালিয়ে রেখে তিনি নিজের ঘরে এসে শক্ত করে দরজা লাগিয়ে দিলেন। আর ঠিক তখনি ঘর... ঘর... শব্দটা আবার হল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন কেউ একজন কিংবা খাটিয়াটা নিজেই ঘষটাতে ঘষটাতে তাঁর ঘরের দিকেই ...গিয়ে আসছে, হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। রকিব টের পেলেন।

তিনি কুলকুল করে ঘামছেন। খুব বেশি ভয় পেলে মানুষ যেমন হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠে রকিবের তাই হল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন সশব্দে দরজা খুলতে গিয়ে অনুভব করলেন দরজাটা খুলছে না। তাঁর যেন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল গায়ের জোরে ধাক্কা দিলেন। একটু ফাঁক হল দরজাটা। তিনি দেখলেন ঠিক তার দরজার মুখে খাটিয়াটা হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রকিবের। তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিলেন প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজাটা হাট করে তখন খুলে গেল। কাঠের খাটিয়াটা ছিটকে একটু সরে গেল আর তখন ব্যালেন্স রাখতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়লেন রকিব ঠিক খাটিয়াটার উপর একদম লম্বা হয়ে। মাথার ভিতর একশোটা একশো ওয়াটের বাল্ব দপ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। জ্ঞান হারালেন রকিব খন্দকার।

জ্ঞান ফিরল রকিবের পরদিন একটা ক্লিনিকের বেডে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, তার স্ত্রী ঝুঁকে আছে তার মুখে উপর।

'এখন কেমন বোধ করছ?'

'আমার কী হয়েছিল?'

'কিছু হয়নি... ভালো হয়ে যাবে।'

'খাটিয়াটা কোথায়?'

'কিসের খাটিয়া? কী বলছ?' রকিবের স্ত্রী অবাক হলেন। আর কি আশ্চর্য। হঠাৎ রকিব খেয়াল করলেন তিনি ক্লিনিকের যে বিছানাটায় শোয়া সেটা... সেটা ঠিক গত রাতের খাটিয়াটাই যেন... তিনি যেন খাটিয়ায় শুয়ে আছেন...বুকের ভিতর চাপ ধরে থাকা ব্যথাটা হঠাৎ বেড়েগেল... তিনি কিছু বলতে চাইলেন, বলতে পারলেন না। ... তার স্ত্রী এগিয়ে এলেন।

'কী হল তোমার, ঘামছো কেন?'

রকিব খেয়াল করলেন তার স্ত্রীর পরিচিত মুখটা আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

ভুতুড়ে বাড়ি

'এই যে ঐ বাড়িটা।'

আমি তাকিয়ে দেখি চারদিকে ক্ষেত খামার জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ একটা সাদা দোতালা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার চারপাশে বেশ জঙ্গলা ভাব। সামনে একটা বিশাল নারকেল গাছ। নারকেল ধরেছেও প্রচুর। নারকেল পাড়ার লোক নেই। হয়তো ভুতুড়ে বাড়ি বলে কেউ ভয়ে নারকেল পাড়তে আসে না।

'তাহলে এটাই তোমাদের সেই বিখ্যাত ভুতুড়ে বাড়ি?'

'হুঁম্।'

'তাহলে চল ভিতরে যাওয়া যাক।'

'না আপনে যান।'

'সেকি তুমি যাবে না?'

'জ্বে না। আমার যাওয়া নিষেধ আছে।' বলে সে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। মানে এক রকম পালিয়েই গেল।

কী আর করা, আমি একাই রওনা হলাম বাড়িটার দিকে। তখন সময় কত হবে– বিকেল চারটা সাড়ে চারটা। আমি আসলে এসেছি একটা ভূতের ইন্টারভিউ নিতে। বহু খোঁজ খবর করে এই ভূতের বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে।

স্থানীয় লোকজনরা বলেছে এ বাড়িতে কম করে হলেও এক ডজন ভূত আছে। এক ডজন ভূতের কোনো দরকার নেই আমার। আমার দরকার মাত্র একজন ভূতের, যে আমাকে ছোটখাটো একটা ইন্টারভিউ দেবে, যেটা আমি আমার পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকের (ফিচার বিভাগের) হাতে দিয়ে বলব, 'এই আপনার ভূতের ইন্টারভিউ।' আজকাল দেশে প্রায় প্রতিদিন একটি করে নতুন দৈনিক কাগজ বেরুচ্ছে, কাজেই নিত্য নতুন লেখা পাবে

boighar.com

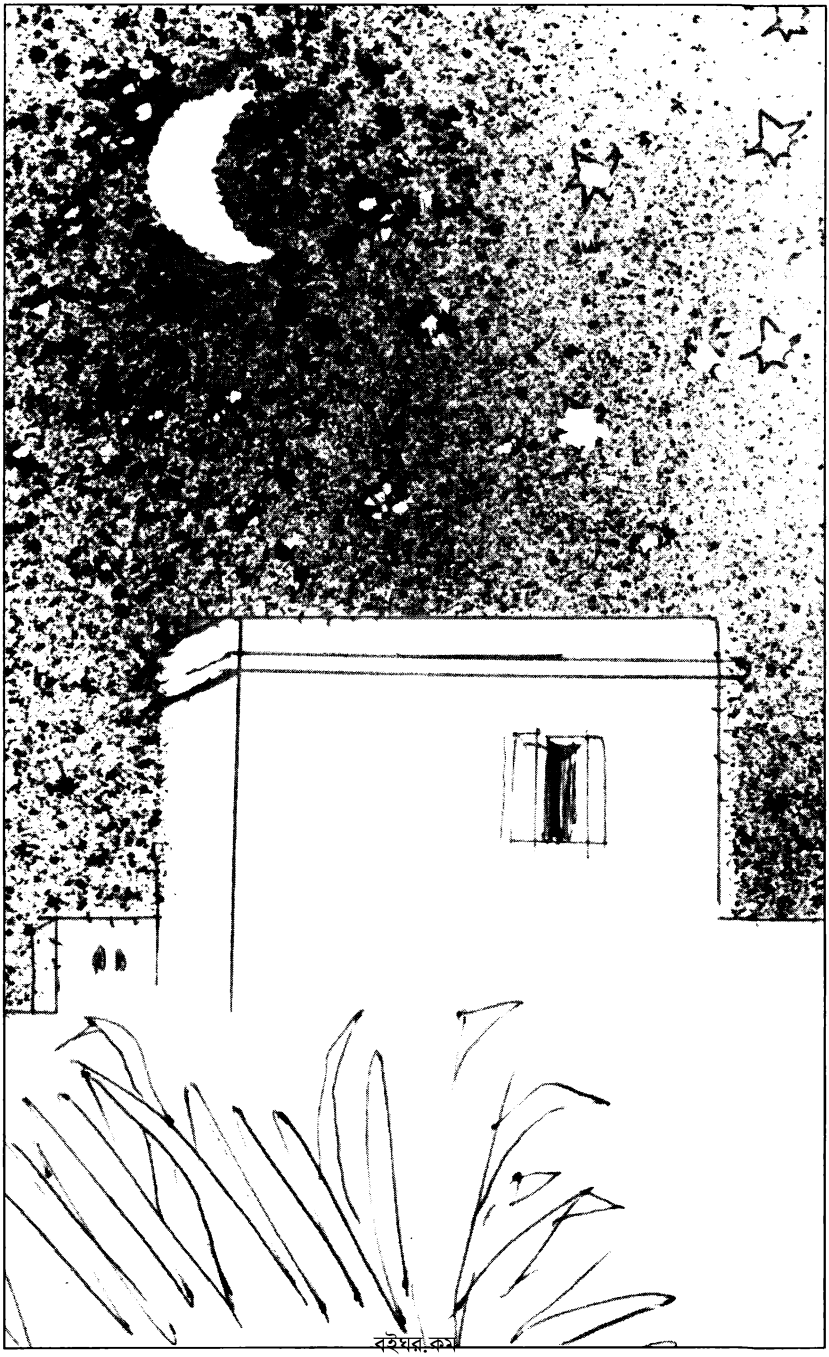

বইঘর.কম

কোথায়? লেখায়ও তো নতুনত্ব থাকা চাই, তাই বহু ভেবে চিন্তে এই ভূতের ইন্টারভিউ আমার পাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদককে খাওয়ানো যাবে। অবশ্য ভূত আঙ্কেল যদি ইন্টারভিউটা দিতে সম্মত হন।

বাড়িটা খুব পুরনো বলা যাবে না। এই বাড়ির পূর্ব ইতিহাস হচ্ছে– এ গ্রামের একজন ধনী লোক যিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। হঠাৎ গ্রামে বেড়াতে এসে এই বাড়িটি তৈরি করেন। নেহায়েত সখেই বলা যায়। তারপর হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়ে যান। গ্রামের লোকজন একদিন তাকে খুঁজতে এসে দেখে তিনি মরে পড়ে আছেন। তার লাশে পঁচন ধরেছে... চারদিকে দুর্গন্ধ। সেই থেকে এটা ভুতুড়ে বাড়ি।

আমি মনে করি আমি নিজে যথেষ্ট সাহসী। ভূতে বিশ্বাস করি। তবে ভয় পাই না। তাই আমি বেশ ঘট ঘট করে সদর দরজা খুলে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলাম। বাড়ির ভিতরটা বেশ গোছানো। তবে প্রচুর ধুলো। আর আশ্চর্যের ব্যাপার প্রায় প্রতিটি ঘরে বড় বড় আয়না লাগানো।

ভদ্রলোকের বোধ হয় আয়নার প্রতি দুর্বলতা ছিল। আমি নিচতালায় প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলাম মানে দোতালায়। দোতালায় মাত্র দুটি ঘর, একটি বাথরুম। আর বড় একটা ছাদ। খোলা বারান্দা। আবার নিচে নেমে এলাম। এ-ঘরও-ঘর ঘুরে সঙ্গের মিনি টেপটা অন করলাম, তারপর চিৎকার করলাম 'হ্যালো মি. প্রেত, আমি দৈনিক দিনের খবর পত্রিকা থেকে এসেছি...আপনার একটা ইন্টারভিউ দরকার।' না ভূতের কোনো ধরনের সিমটম পেলাম না।

প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ বাড়িটাতে ঘোরাঘুরি করলাম। কোনো রকম লক্ষণ পেলাম না। শেষে মনে হল সাপের কামড় না খাই। শেষ পর্যন্ত চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং চলেই এলাম। মেজাজটা খারাপ হল। ফিচার বিভাগের সম্পাদক নজরুল ভাইকে বলে এসেছিলাম দুর্দান্ত একটা ইন্টারভিউ হবে হতেই হবে। সব গেল। নজরুল ভাই বলেছিল ভালো একটা ইন্টারভিউ...মানে এক্সসেপশনাল কিছু করতে পারলে এবার তোমার চাকরিটা পার্মানেন্ট করে নেব। সম্পাদকের সঙ্গে কথা হয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি...সব গেল।

মেসে ফিরে এসে একবার ভাবলাম বানিয়ে বানিয়ে একটা ভূতের ইন্টারভিউ লিখে জমা দিয়ে আসি। রাতের মধ্যেই জমা দেয়ার কথা ছিল।

boighar.com

পাতাটা বেরুবে কাল। ঝোলা থেকে মিনি টেপটা বের করতে গিয়ে অবাক হলাম। টেপটা নেই। যাহ্ শালা, মরার উপর খাড়ার ঘা। টেপটা আমার না, নজরুল ভাইয়ের। ফেলে এসেছি ভুতুড়ে বাড়িতে। এখন? ভীষণ মেজাজ খারাপ হল। কী করব ভাবতে ভাবতে কখন যে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পেলাম না।

পরদিন ঘুম ভাঙল মেস পার্টনার রকিবের ডাকে।

'কী হল?'

'আরে তোর লেখাটা সত্যিই দারুণ হয়েছে। এটা বোঝাই যাচ্ছে সত্যি না বানিয়ে লিখেছিস, কিন্তু চমৎকার হয়েছে।'

'কোনটা?'

'আরে এই যে দিনের খবর পত্রিকায় ফিচার পাতায় তোর ভূতের নেয়া কাল্পনিক ইন্টারভিউটা।'

আমি হতভম্ব হয়ে দেখি দিনের খবরে আমার নাম-ধাম সহ ছাপা হয়েছে বিশাল একটা ইন্টারভিউ। সঙ্গে একটা ছবিও আছে, একটা অশরীরী...। আমার আর সহ্য হল না,ছুটে গিয়ে টেলিফোনের দোকান থেকে ফোন করলাম নজরুল ভাইকে।

'হ্যালো নজরুল ভাই।'

'আরে ফয়সল তুমি কোথায়? কালকে টেপটা দিয়ে গেলে কার কাছে, দেখা পর্যন্ত করলে না। খুব ভালো হয়েছে ইন্টারভিউটা। পাবলিক খেয়েছে ভালো। অনেক ফোন আসছে। ছবিগুলোও ভালো তুলেছ। ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলে? তবে তোমাকে আবারো থ্যাংকস যে তুমি ছবিগুলো বুদ্ধি করে হার্ড ডিস্কে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছ, নইলে মেটার রেডি করায় সমস্যা হত...। যাহোক চলে এসো অফিসে, কথা আছে...'

টেলিফোনের বিল মিটিয়ে আমি টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। আমি এখন কার কাছে যাব? কাকে বলব? কী বলব? কেন বলব?

পাথর

পাথরটার রং কালো। বেশ বড়সড় পাথর। বাসার কাছেই রাস্তার ধারে খুব অবহেলায় পড়েছিল কেন কে জানে। শরীফ কী মনে করে পাথরটা তুলে নিল। তুলে নিতে গিয়ে টের পেল যতটা ওজন হবে ভেবেছিল তার চেয়েও দ্বিগুণ ওজন পাথরটার। বাসায় আসতেই স্ত্রী রুনা বেশ অবাক হল।

তোমার হাতে ওটা কী?

পাথর।

হ্যাঁ স্রেফ একটা পাথর, দি স্টোন।

তা হঠাৎ পাথর কেন?

এর উত্তর স্ত্রীকে না দিয়ে শরীফ সোজা ঢুকে গেল বাথরুমে,বেসিনে রেখে ভাল করে ধুলো পাথরটা। তারপর ভাল করে মুখে নিয়ে এনে রাখল ড্রইংরুমে বুক সেলফের একটা ধারে। সাদা বুক সেলফটার সাথে বেশ ম্যাচ করেছে কালো পাথরটা। চিৎকার করে স্ত্রী রুনাকে ডাকল কয়েকবার।

কী হলো? চেঁচাচ্ছো কেন?

দেখ তো কেমন হল পাথর সাজানোটা?

চমৎকার।

স্ত্রীর বলার ঢংয়ে আহত হল শরীফ। কিন্তু কিছু বলল না। সে মুগ্ধ চোখে পাথরটার দিকে তাকাল। পাথর সব সময় সাদা হয় কিন্তু এ পাথরটা এমন কুচকুচে কালো হলো কী করে? প্রকৃতির কী সব অদ্ভুত খেয়াল।

খাবার টেবিলে খেতে বসে রুনা বলল।

দেখো তোমার পাথর কিন্তু ওখান থেকে সরাতে হবে।

boighar.com

বইঘর.কম

কেন? সাদা বুক সেলফের সঙ্গে কেমন ম্যাচ করেছে। খেয়াল করেছ?

ঐ সব ম্যাচিং ফ্যাচিং আমি বুঝি না। ঐ বিদঘুটে কালো পাথর আমি ঐখানে রাখতে দিব না।

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, কটা দিন থাকুক না!

রুনা আর কথা বাড়াল না। দুজনে নীরবে খেয়ে উঠল।

মাঝরাতে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল শরীফের। প্রায় লাফিয়ে উঠল রুনাও।

কিসের শব্দ?

বুঝতে পারছি না।

শব্দটা এসেছে ড্রইং রুম থেকে। ছুটে গেল শরীফ ড্রইং রুমের দিকে, পিছে পিছে এল রুনা। ড্রাইং রুমে সব ঠিকঠাক আছে যেখানে যেটা থাকার কথা। তাহলে শব্দটা হল কিসের? হঠাৎ থমকে গেল দুজন। পাথর। কালো পাথরটা মেঝেতে পড়ে আছে। এটা কী করে সম্ভব? এত ভারি একটা পাথর বাতাসে আছড়ে পড়বে না মাটিতে, কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলার মতোও ঘরে কেউ নেই।

শরীফ বোকার মতো তাকাল রুনার দিকে। রুনা ফ্যাকাসে গলায় বলল, পাথরটা কে ফেলল?

বুঝতে পারছি না!

পাথরটা এখনি বাইরে ফেলে দিয়ে আসো। আমার কেমন ভয় করছে।

এখন এত রাতে?

হ্যাঁ এখনই। রুনার গলায় কেমন একটা জেদের সুর।

বেশ, একটা ব্যাগ দাও তো।

ব্যাগ কেন?

ব্যাগে ভরে বাইরে ফেলব। এত রাতে হাতে করে পাথর নিয়ে যাচ্ছি এটা কেমন দেখায়?

ব্যাগে পাথরটা ভরে শরীফ যখন গেট খুলে রাস্তায় এল তখন তার

নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগছিল। এক নাম্বার কারণ– এত রাতে সে পাথর ফেলতে বাইরে যাচ্ছে। দুই নম্বর কারণ– তার ব্যাগে স্রেফ একটা কালো পাথর, তিন নম্বর কারণ...

boighar.com

স্যার কই যান?

ধ্বক করে উঠল শরীফের বুকটা। ব্যাগের ভিতর থেকে পাথরটা যেন কথা বলে উঠল। না, শরীফ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তাদের এলাকার নাইট গার্ড রফিক। পিছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি শরীফ।

ও তুমি রফিক।

স্যার, এত রাইতে যান কই?

রফিক আমার সাথে একটু আসো তো...

চলেন কই যাইবেন?

এই একটু সামনে।

রফিক ছেলে ভাল। বয়সে তরুণ। সে সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে আসে।

স্যার, ব্যাগে কী?

ব্যাগে... হাত বদল করে শরীফ একটু লজ্জা পায় যেন।

ব্যাগটা আমার হাতে দেন। খুব ভারি নাকি?

এক রকম জোর করেই ব্যাগটা তার হাতে নিয়ে নেয় রফিক। ব্যাগটা হাতে নিয়েই সে হাসে।

বুঝছি বিলাই। এই এলাকায় বিলাই বড় বাড়ছে... এই দেহেনশালায় লড়তাছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

স্যার, আপনে বাসায় যান। আমি শালারে দূরে ফালায়া দিমুনে। শরীফের গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় না। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ফাঁকে রফিক দ্রুত পায়ে ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যায় অন্ধকারে।

বাসায় এসে দেখে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে রুনা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

ফেলেছো?

হুঁম্।

চা খাবে?

দাও।

রুনা চা আনতে গেল। ড্রইং রুমে একা বসে শরীফ পাথর সংক্রান্ত ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করে। রাত অবশ্য খুব বেশি হয়নি। দুটো বাজে। মাঝে মাঝে টিভিতে মুভি দেখে সে রাত তিনটা চারটা পর্যন্তও জেগেছে। কিন্তু আজ...

তোমার চা।

নিজের কাপে চুমুক দিয়ে রুনা বলে,

এটা কেমন হল বল তো?

কোনটা?

এই যে পাথরটা...মানে পাথরের ব্যাপারটা?

এ সময় দরজায় কেউ নক করল।

এত রাতে আবার কে এল?

"কে?" ভেতর থেকে চিৎকার করল শরীফ।

স্যার আমি রফিক।

দরজা খুললো শরীফ।

কী ব্যাপার রফিক?

স্যার, ঐডা বিড়াল ছিল না...। প্রায় আর্তস্বরে বলে রফিক।

তোমার একি অবস্থা?

হতভম্ব শরীফ তাকিয়ে দেখে রফিকের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। জামা ছেঁড়া। এক হাত দিয়ে টপ টপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। রুনা এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল,

এসব কী হচ্ছে? ও এখানে কেন?

স্যার ঐডা কিন্তু বিলাই না। একটা কালো রঙের...ঐ যে আইতাছে আমার পিছে পিছে... প্রচণ্ড ভয়ে রফিক ঘরে ঢুকতে চাইল। গেটের বাইরে শরীফ আর রুনা একটা ভারী কিছু গড়িয়ে গড়িয়ে আসার শব্দ শুনলো– ঘর...ঘর...ঘর...!!

boighar.com

পেত্নী

ডান দিকের রাস্তা দিয়ে যান সময় বেশি লাগব, তবে ভয় নাই।

কেন বাম দিকের রাস্তায় সমস্যা কী? ভয় কিসের?

ঐ রাস্তায়...বৃদ্ধ থেমে গেলেন।

ঐ রাস্তায়? মারুফ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় দুই রাস্তার মোড়ে গাছতলায় বসে থাকা বৃদ্ধের দিকে।

বাম দিকের রাস্তায় একটা তেঁতুল গাছ আছে।

তাতে সমস্যা কী? তেঁতুল গাছ তো থাকতেই পারে।

তেঁতুল গাছে একটা খারাপ পেত্নী আছে।

মারুফ এবার উঠে দাঁড়াল। এই বুড়া তার অনেক সময় নষ্ট করেছে। সে বাম দিকের রাস্তা ধরেই হাঁটা ধরল। কাঁধের হ্যাভার সেকটা এখন আর আগের মতো ভারি লাগছে না।

মারুফ এই গ্রামে এসে পৌঁছেছে ঘণ্টা খানেক আগে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাকে যেতে হবে এ গ্রামের উপর দিয়ে আরো ভিতরের একটি গ্রামে, প্রায় ছ' কিলোমিটার হাঁটতে হবে। গ্রামের নাম মুরাদপুর। সেখানে অ্যাস্ট্রানামিক্যাল সোসাইটির মিলন ভাই তার জন্য অপেক্ষা করবেন, সে রকমই প্ল্যান। তারপর তারা দুজন সীমান্ত পার হয়ে... সে অন্য গল্প।

মারুফের ভাল লাগছে হাঁটতে। সে আগেও শুনেছে এই গ্রাম থেকে দুই পথে যাওয়া যায় মিলন ভাইদের মুরাদপুরে। মিলন ভাই বলেছিলেন, 'যে কোনো রাস্তায় তুমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসতে পার। তবে হেঁটে আসতে হবে, ঐ পথে এখনও রিকশা চালু হয়নি।'

বইঘর.কম

boighar.com

ঐ দুই রাস্তার মোড়ে এসে গাছের ছায়ায় বসে বুড়ার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে রাস্তার খোঁজ খবর নিতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। তবুও যা হোক ক্লান্তিটা দূর হয়েছে আর একজন পেত্নীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই বা মন্দ কী।

বৃদ্ধের বর্ণনা অনুযায়ী তেঁতুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল মারুফ। মারুফের হাতঘড়িতে রাত আটটা। একটা গ্রামের জন্য যথেষ্টই রাত। আর এই জনমানবহীন পথে মনে হচ্ছে নিঃসীম শূন্যতা... আকাশে একখণ্ড চাঁদ ঝুলে আছে, পাশে বন্য প্রকৃতি নিশ্চুপ, শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার টানা শব্দে নির্জনতা ভঙ্গ হচ্ছিল বারবার। ভূত-প্রেত-পেত্নী এসবে মারুফের দারুণ আগ্রহ। যদিও এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে চাক্ষুস সাক্ষাৎ হয়নি কখনো।

হ্যাভার সেক খুলে এক ঢোক পানি খেল মারুফ। তারপর সিগারেট ধরাল। সে যথেষ্ট সাহসী ছেলে। প্রায়ই সে আর মিলন মিলে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় অ্যাডভেঞ্চার করে থাকে। এবার অবশ্য একক অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। সিগারেটের লম্বা টান দিয়েধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল তেঁতুল গাছ। বৃদ্ধের কথা মত এই গাছেই পেত্নীরথাকার কথা। কিন্তু কৈ? সিগারেটটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলতেই তার নাকে এলো তীব্র ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়ার গন্ধ। বাজে টয়লেটে এই গন্ধটা পাওয়া যায়। হঠাৎ করে গন্ধটা আসায় ভিতরে ভিতরে চমকালো মারুফ। কিন্তু গুরুত্ব দিল না। হ্যাভার সেকটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটা দিল। আর তখনই ঘুঙ্গুরের শব্দটা কানে এল তার। ঘুঙ্গুর পরে কেউ যেন তার পেছন পেছন আসছে। মারুফ ঘুরে দাঁড়াল তারপর ঠাট্টার সুরে চেঁচিয়ে বলল।

পেত্নী ম্যাডাম, আপনি কোথায়?

তার চিৎকারটা প্রতিধ্বনি হল চারদিকে। প্রতিধ্বনির শেষ রেশটুকু থেমে যেতেই বাক্যটি কানে এল মারুফের "এই তো তোমার পিছনে... আমি।"

ঝট করে পেছনে ঘুরলো মারুফ, তার বুকের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে টগবগ করে ছুটে গেল শরীরের প্রতিটি প্রান্তে। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে! ময়লা সালোয়ার কামিজের মত কিছু একটা পরা। মেয়েটির গলার কারণেই যেন আরো বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। তবে অন্ধকারে তার দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা।

বইঘর.কম

তুমি কে?

মারুফ ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করার চেষ্টা করল। কিন্তু টের পেল তার গলা কাঁপছে। সে কি ভয় পেয়েছে? মারুফ আড়চোখে দেখল তার হ্যাভার সেকের সাইড ব্যাগে রাখা বোতলটার ভিতরে অর্ধেক পানি থির থির করে কাঁপছে।

তুমি ডরাইছ?

মেয়েটি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে ওঠে। মেয়েটির কথায় সঙ্গে সঙ্গে ভয় দূর হয়ে যায় মারুফের। সে নিজেই ঘাড় থেকে হ্যাভার সেকটি নামায়। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বলার চেষ্টা করে।

তা একটু পেয়েছি। কিন্তু তুমি কে? এত রাতে এখানে কী করছ?

আমি পেত্নী... এই তেঁতুল গাছে থাকি।

তাই! তা এখন কী করতে চাও?

পেত্নীরা যা করে তাই করব।

পেত্নীরা কী করে?

মানুষের ঘাড় মটাকায়া চুমুক দিয়া রক্ত খায়।

মেয়েটি মুখ মুচালো করে রক্ত চুমুক দেয়ার ভঙ্গি করে।

মারুফের ভয় তখন কেটে গেছে, এটি আর যাই হোক পেত্নী নয়। গ্রামের কোনো পাগলী মেয়ে। হয়ত পালিয়ে এসে...

তুমি ঘুইরা দাঁড়াও। তোমার ঘাড় মটকাব।

ছি মা, ওরে ছাইরা দে।

মারুফ দ্বিতীয়বার চমকে পেছন ফিরে দেখে সেই বৃদ্ধ কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দুজনের পিছনে। মারুফ তখন নিশ্চিত হল এটা একটা প্রতারক চক্রের সাজানো নাটক। এই মেয়েটি বৃদ্ধের মেয়ে। দুজনে মিলে এখন কোনো একটা ঘটনা ঘটাবে...

'এ আমার মেয়ে। তবে মানুষ না পেত্নী।' বৃদ্ধ বলে উঠে।

তাহলে আপনি কে?

আমি?

এ একটা শখ!

চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটি। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খিল খিল করে হেসে উঠে। আর তখনই অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধটা আবার নাকে আসে মারুফের।

boighar.com

আপনি ফিইরা যান। বুড়া ফিস ফিস করে বলে, এখনো সময় আছে... যদি বাঁচতে চান।

ক্যান?

একবার তো কইছি ও ভাল না...আপনেরে জানে মারবো।

মারার চেষ্টা করে দেখুক না।

ভিতরে ভিতরে সতর্ক হয়ে গেছে মারুফ। নিশ্চয়ই বুড়ো তার সঙ্গে আসল খেলা খেলবে এখন। মারুফও ছাড়বে না। সে ব্ল্যাক বেল্ট টাইকাণ্ডু এক্সপার্ট, এক সঙ্গে তিন চারজনকে ধরাশায়ী করা তার জন্য কোনো ব্যাপার না।

আর তখনি মেয়েটি দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে ঘোড়ার মত কেমন এটা চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ... শব্দ করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এল মারুফের দিকে। মারুফ এক পা পিছে সরে এসে দাঁড়ানোর সময়টাও পেল না... দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে মেয়েটি ছুটে এসে কেমন অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে উঠে জোড়া পায়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল মারুফের বুকে।

মারুফ রুখে ওঠার সময়টাও পেল না, দমটা যেন গলার কাছে আটকে গেল, তারপর... উঠে পাল্টে গড়িয়ে পড়ল পাশের নিচু ঝিলের পানিতে। পানি খুব গভীর নয়। হাঁটু পানির বেশি হবে না। সেখানেই উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে শুনলো ছপাৎ ছপাৎ করে পানি ভেঙ্গে এগিয়ে আসছে...

কে? মেয়েটি? না সেই বৃদ্ধ? এ সময় সে বৃদ্ধটির কাতর গলা শুনতে পেল 'মারে যাইস না...' তখনই পিছনে কেউ শক্ত হাতে তার মাথাটা ধরে পানির মধ্যে চেপে ধরল। প্রচণ্ড কষ্টে মারুফের বুকটা আঁই টাঁই করছে। কট করে একটা শব্দ এর তার কানে, ঘারের কাছে তীব্র একটা ব্যথা ঝিলিক দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। তাহলে কি ঘাড়টা ভেঙ্গে দিল? দম আটকানোর প্রচণ্ড কষ্টটা আর নেই। তার কানের কাছে একটা মেয়েলী কণ্ঠ ফিস ফিস করল, 'মনে কিছু নিও না, তোমার জানডা কিন্তু নিলাম...।'

বিড়াল

ক'দিন ধরে নোমানের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে– কেউ যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি, কিন্তু কে? কে তাকিয়ে আছে? সেটাই ধরা যাচ্ছে না। কি রাত কি দিন কেউ যেন চব্বিশ ঘণ্টা তাকিয়ে আছে তার দিকে, কি সে?

তবে না, খুব শীঘ্রই নোমান আবিষ্কার করে ফেলল সেই 'তাকানিয়া আসামী' কে। একটা বিড়াল। স্রেফ একটা সাদা ছোট্ট বিড়ালের বাচ্চা। চোখ দুটো নীল, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কখনো টেবিলের তলা থেকে, কখনো বিছানার তলা থেকে...একদম স্থির দৃষ্টিতে। তার তাকিয়ে থাকাটা অস্বস্তিকর তবে এখন অস্বস্তিটা একটু কম, কারণ তাকিয়ে থাকার বস্তুটি একটা ছোট্ট সুন্দর নির্ভেজাল বিড়ালের বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিড়াল নোমানের প্রিয় প্রাণী। কিন্তু এ বিড়ালটি তার কাছে আসে না, ধরতে গেলে লাফিয়ে সরে যায়। ফের তাকিয়ে থাকে।

খুব শীঘ্রই নোমান বিড়ালটির উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। সে সিদ্দিককে ডেকে পাঠাল।

মুরে বুলাইছেন?

সিদ্দিক?

জ্বী।

একটা কাজ করো।

জ্বী কী কাজ?

ঐ যে সাদা বিড়ালটা, ওটাকে ধরে ফেলে দিয়ে আসো। অনেক দূরে ফেলবে।

কোন বিড়ালটা?

আরে ঐ যে খাটের নিচে বসে আছে।

boighar.com

বইঘর.কম

কই?

নোমান অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। গাধাটাকে আর রাখা যাবে না।

গাধা কোথাকার? চোখে দেখ না ঐ বিড়ালটা খাটের পায়ের কাছে বসে আছে?

সিদ্দিক অবাক হয়ে খাটের পায়ার কাছে এগিয়ে যায়। তার চেয়েও অবাক হয়ে নোমান লক্ষ্য করেন সিদ্দিক এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারছে যেন বিড়ালটা খুঁজছে, কিন্তু বিড়ালের বাচ্চাটা এক বিন্দু নড়ল না, যেন সিদ্দিক বলে ওখানে কেউ নেই। আর কি আশ্চর্য, তখনও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিড়ালটি তার দিকে।

খুব শীঘ্রই নোমান টের পেলেন ঐ সাদা বিড়ালটিকে শুধু তিনিই দেখতে পাচ্ছেন, সিদ্দিক দেখতে পাচ্ছে না। তিনি তাদের একাধিক বার ডেকে এনে বলেছেন, তোমরা দু'জন খুঁজে বের করো এ ঘরে কোন বিড়াল আছে কিনা? নোমান দেখেছেন বিড়ালটি দরজার পাশে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু আশ্চর্য তারা দেখতে পাচ্ছে না। এটাও কি সম্ভব?

নোমান অবিবাহিত। বিয়ের বয়স চলে গেছে তা বলা যাবে না, একা থাকেন পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বিশাল বাড়িতে। বাড়িতে কেয়ার টেকার সিদ্দিক আর দারোয়ান আব্দুল। একটা ঠিকা ঝি এসে রান্না-বান্না করে দিয়ে যায়। এই তো নোমানের সংসার। নোমান কিছুই করে না। এক সময় করতেন, এখন অবসর জীবন যাপন করছেন...যদিও অবসর জীবন কাটানোর বয়স তার এখনো হয়নি।

ছার, কোনো বিলাই নাই। সারা বাড়ি বিছরাইলাম।

নোমান মাথা ঘুরিয়ে আব্দুলের দিকে তাকালেন। দেখেন আব্দুল তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার চোখের মণি দুটো মনে হচ্ছে ঠিক গোল নয়, বিড়ালের দিনের বেলার চোখের মত লম্বাটে। তার ভুলও হতে পারে, তবে কোনো কারণ ছাড়াই ধ্বক করে উঠল তার বুকটা।

ঠিক আছে যাও। সিদ্দিককে বলো এক কাপ চা দিয়ে যেতে।

নোমান এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা টাইপের মানুষ, চট করে উত্তেজিত হন না। বিড়াল দেখতে পাওয়া না পাওয়ার ঘটনায়ও তিনি উত্তেজিত হলেন না। ঠাণ্ডা মাথায় গোলমালটা ধরার চেষ্টা করছেন তিনি।

নোমান তাকিয়ে দেখেন সিদ্দিক তাকিয়ে আছে তার দিকে। তারা কি

boighar.com

তাকে পাগল টাগল ভাবছে। আর তখনই খেয়াল করলেন সিদ্দিকের চোখের মণি দুটোও ঠিক গোল নয় লম্বাটে। তার ভুলও হতে পারে কিন্তু নোমানের হঠাৎ করে মনে হল– আরে এতো বেড়ালের এক জোড়া চোখ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সে রাতে ঘুমুতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে সারা রাত ছটফট করলেন নোমান। দারুণ একটা অস্বস্তি... কেন যেন মনে হচ্ছে তিন জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার হাড় মাংস অস্থি মজ্জা টিপে টুপে দেখছে। দু'জন মানুষ আর একজন বিড়াল। বিড়ালটাকে ক'দিন ধরে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। তারপরও তার মনে হচ্ছে আশেপাশেই আছে কোথাও বিড়ালটা। তাকিয়ে আছে তার দিকে। সিদ্দিক আর আব্দুলও ক'দিন ধরে তাকাচ্ছে ঠিক বিড়ালের মত কেমন এক কৌতূহলী চোখে। হয়ত ভাবছে তাদের মনিব পাগল-টাগল হয়ে গেছে।

ভোর রাতের দিকে চোখ দুটো বুঁজে এল। ছোট্ট একটা শব্দ হল। ঘরের ভিতরে কিছু ঢুকলো যেন। ঘুম ঘুম চোখে নোমান ভাবলেন– কে ঢুকলো? সেই বেড়ালটা? যেটাকে আব্দুল আর সিদ্দিক দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি দেখতে পান। যেটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে?

প্রাণীটি বিছানায় লাফিয়ে উঠল নোমান টের পেলেন, বিছানাটা নড়ে উঠেছে। ছোট্ট বিড়ালটা লাফিয়ে উঠলে বিছানাটা এতটা নড়ে উঠার কথা নয়। বাকি আছে দেখেন কিন্তু তার সাহস হচ্ছে না। কী দেখবেন তিনি...? বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা ধ্বক ধ্বক করছে। ঠিক তখনই ঘাড়ের উপর বড় নিঃশ্বাস ফেলল কেউ। উত্তাপটা টের পেলেন, সাথে বিশ্রী গন্ধ। নোমানের অনুভূতিটা কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে, একই সাথে ভয়, উৎকণ্ঠা আর বিস্ময় মিলেমিশে তাকে গ্রাস করেছে যেন। তবে তিনি নড়াচড়ায় টের পেলেন তার বিছানায় উঠে আসা চারপেয়ে প্রাণীটি বিশাল কিন্তু সেটি কোনো বিড়াল জাতীয় প্রাণী নয়...অন্য কিছু...!!

এ সময় বাইরের দরজায় ধূম-ধাম আওয়াজ হল। আব্দুল আর সিদ্দিক চেঁচাচ্ছে।

স্যার, দরজা খোলেন। দরজা খোলেন!!

বইঘর.কম

নোমানের কাঁধের ভিতর 'দরজা খোলেন' 'দরজা খোলেন' বাক্যটি বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নোমানের ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলেন 'কেন কী হয়েছে?' তিনি হয়ত বলার চেষ্টাও করলেন কিন্তু টের পেলেন তার গলা দিয়ে ঘর ঘর ধরনের শব্দ হল।

আর তখনই টের পেলেন, আরো প্রবল জোরে শব্দ হতে লাগল দরজায়। নোমান এটুকু অন্তত বুঝলেন, দরজাটা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। কে জানে হয়ত এখনই ভেঙ্গে ফেলবে ওরা।

ঘাড়ের কাছে তীব্র যন্ত্রণার একটা অনুভূতি হল নোমানের। তবে কি প্রাণীটি কামড় বসিয়েছে?

নোমানকে পাওয়া গেল না তার ঘরে। তার শূন্য বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা গেল মরা একটা বিড়ালকে। এত বড় বিড়াল এই গ্রামে আগে কেউ দেখেনি। বিড়ালটা মরা, ঘাড়ের কাছে রক্তে দাগ। অবশ্য আদৌ সেটা বিড়াল কিনা কে জানে।

boighar.com

মাউস

কম্পিউটারের মাউসটা কাজ করছে না তানিমের। মনিটরে কারসারটা আটকে যাচ্ছে বারবার। একটা মাউস যে কিনে আনবে মনেই থাকে না তার। তবে কাল কিনতেই হবে। কারণ তার থিসিস পেপারটা জরুরি ভিত্তিতেই শেষ করতে হবে।

কিরে তানিম, ইঁদুর মারার ওষুধ এনেছিলি? মা জানতে চান।

ওফ মা, আমি আমার পিসির মাউসের জ্বালায় কাজ করতে পারছি না! আর তুমি এসেছ তোমার ইঁদুর নিয়ে!

আরে বাবা ঘরে টেকা যাচ্ছে না ইঁদুরের জ্বালায়। ঐ যে ঐ যে দেখ দেখ একটা। ধাড়ি ইঁদুর...

তানিমের কি হল পর্দার লাঠিটা চট করে খুলে ছুটে গেল ইঁদুরের পিছু পিছু। কিন্তু ইঁদুর ধরা কি এতই সোজা? কিন্তু কি আশ্চর্য তানিম ইঁদুরটাকে স্টোর রুমের কোনায় পেল, ইঁদুরটা ছুটে পালাল না, ঘাড় ঘুরিয়ে কেমন একটা ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল তানিমের দিকে। যেন বলতে চাইছে 'আমাকে মেরো না প্লিজ' তানিম মোটামুটি সিওর যে তার লাঠির বাড়ি দেয়ার আগ মুহূর্তে সে একটা লাফ দেবে। তারপরও একটা চান্স নেয়া যাক না। সজোরে লাঠিটা নামিয়ে আনল তানিম। নির্ভুল টার্গেট এক ইঞ্চি নড়ল না। ধ্যাপ করে কেমন একটা শব্দ হল, জায়গায় বসে থেঁতলে গেল ইঁদুরটা। গাটা ঘিন ঘিন করে উঠল তানিমের, লাঠিটা স্টোর রুমে ফেলে রেখেই বেরিয়ে এল সে।

মা তোমার ইঁদুর খতম!

বলিস কী। এত সহজে মরল?

মরবে না ব্যাটা কার হাতে পড়েছে? তোমার ইঁদুরের সমস্যা মিটলো কিন্তু আমার মাউসের সমস্যাটা তো গেল না।

boighar.com

মাউসের আবার কী হল?

তানিম মার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঢুকে পড়ল তার নিজের ঘরে।

আজ বাসায় তানিম আর তার মা ছাড়া কেউ নেই। বাবা অফিসের কাজে ট্যুরে চট্টগ্রামে। বোন টুম্পা তো হোস্টেলে। এখন বাজে দশটা, তার মানে একটা চান্স নেয়া যায়। পাড়ার কম্পিউটার এক্সসেরিজের দোকানটাতে যদি একটা মাউস পাওয়া যায় তাহলে আজ রাতেই থিসিসের কাজটা শেষ করে ফেলা যায়।

তানিম দেরি করল না। জুতাটা পরে মানিব্যাগটা পকেটে ঢুকালো।

মা, দরজা লাগাও। আমি একটু আসছি।

এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?

রাত কোথায়? আমি এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসব।

বাইরে বেরিয়ে একটা রিকসা নিল। তানিমদের এলাকাটা নিরিবিলি। ঢাকার 'অ্যাপার্টমেন্ট জ্যাম' এখনও এখানে শুরু হয়নি।

স্যার, কই যাইবেন?

এইতো একটু সামনে...সামনের ঐ মোড়টায়।

দোকানটায় মাউস আছে তবে অ্যাপল কম্পিউটারের মাউস। আই বি এম -এর ছিল, শেষ হয়ে গেছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তানিমের। কেমন একটা রাগও চেপে গেল। সে রিক্সাটা নিয়ে আরেকটু এগুলো। আরো কয়েকটা দোকান থাকার কথা সামনে।

রাত সাড়ে এগারোটা দিকে সে একটা মাউস পেল। দাম মিটিয়ে মাউসটা নিয়ে রিকসায় করে ফিরছে। অন্ধকার ফাঁকা মোড়টার কাছে তিনটা ছেলে এগিয়ে এল। একজনের হাতে ঝকঝক করছে ধারালো একটা চাকু; আরেকজনের হাতে একটা রামদা। শূন্য হাতের তরুণটি এগিয়ে এসে রিক্সাটা দাঁড় করাল। হাইজ্যাকার।

হাতে ঐডা কী?

মাউস।

ছেলেটি কেড়ে নিল জিনিসটি। তারপর টান দিয়ে প্যাকেটটা ছিঁড়ে মাউসটা হাতে নিল; মাউসের কর্ডটার এক প্রান্তে ধরে পাঁই পাঁই করে শূন্যে ঘুরাতে ঘুরাতে বলল– মোবাইল কই?

আমার মোবাইল নাই।

ফকিন্নির পুত! তারপর একটা কুৎসিত গালি দিল।

গালি দিয়েই ছেলেটা মাউসের কর্ডটার এক প্রান্ত ধরে ঘুরাতে ঘুরাতে সাঁই করে তার গলার দিকে ছুঁড়ে মারল। আশ্চর্য। কর্ডটা টাইট হয়ে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে গলায় বসে গেল। ভয় পেলেও মনে মনে ছেলেটির টার্গেটের প্রশংসা না করে পারল না। নিশ্চয় এক সময় ভাল ইয়ো ইয়ো খেলতো!

ভাগ শালা! বলে রিকশার চাকায় একটা লাথি দিল তাদের দলনেতা। রিকশাওলা দ্রুত প্যাডেল মারল। ওদের ব্যূহ থেকে বের হয়ে এসে যেন তানিম হাফ ছেড়ে বাঁচল। গলা থেকে মাউসের প্যাঁচিয়ে যাওয়া কর্ডটা খুলতে গিয়ে অবাক হল। প্যাঁচটা খুলছে না! আরো চেপে বসছে যেন। খক খক করে কাঁশল তানিম। দু'হাতে ধরে খোলার চেষ্টা করল...

কিন্তু একি! এ যে আরো চেপে বসেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তানিমের। রিকসাওলা কিছু টের পেল না সে রিকশা টানছে হু হু করে।

তানিমের মা মিসেস জামান অবাক হলেন। বারোটা বেজেছে সেই কখন। তানিমের আসার নাম নেই। মোবাইলটা সঙ্গে নেয়নি যে, ফোন করে খোঁজ নেবেন। হয়তো কোনো বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়েছে। তিনি স্টোর রুমে ঢুকলেন, মরা ইঁদুরটাকে ফেলে দেওয়া যাক। ইঁদুরটা থেতলে গেছে। তবে তার লম্বা লেজটা কেমন অদ্ভুতভাবে গলায় প্যাঁচিয়ে আছে। তিনি ডাস্ট প্যান দিয়ে ইঁদুরটাকে উঠিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।

তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠল। তানিম এসেছে। দরজা খুলে অবাক হলেন মিসেস জামান– দু'জন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

এটা তানিমের বাসা?

জ্বী।

আপনি তানিমের মা?

হ্যাঁ। কেন কী হয়েছে? আমার তানিম কোথায়? প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস জামান। পুলিশ অফিসারটি একটু থামল তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সম্ভবত কেউ তাকে হত্যা করেছে কম্পিউটারের মাউসের তার গলায় প্যাঁচিয়ে... আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন...'

তানিমের মা সশব্দে হাঁটু ভেঙ্গে আছড়ে পড়লেন। পুলিশ অফিসার দু'জন ছুটে এসে ধরতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

boighar.com

অন্য কেউ

চায়ে চিনি নিতে গিয়ে দেখি চামচটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো।

এ কি! চামচ এমন কেন?

আমার বন্ধু বা বন্ধুপত্নী কেউ কোনো কথা বলল না। আমি অবাক হয়ে তাকালাম চঞ্চলের দিকে। চঞ্চল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তার বাসায় বেড়াতে এসেছি দু'দিনের জন্য। কিন্তু বেড়াতে এসেছি বললে ভুল হবে, একটা কাজেই এসেছি। চঞ্চলকে ফোন করেছিলাম, ঢাকা এলেই তাকে একটা ফোন করি।

দোস্ আমি তো ঢাকায় এসেছি।

আমার বাসায় চলে যায়।

তোর নতুন বাসা তো আমি চিনি না।

চব্বিশের তিন, আহমদ নগর। মিরপুর এক নম্বর নেমে ডান দিকের রাস্তা ধরে একটু এগুলেই...ছয় তলার তিন তলায়।

ব্যাস, হোটেলে না উঠে সোজা চঞ্চলের বাসায়। মন্দ কী হোটেলের খরচও বেঁচে গেল। বন্ধুও খুশি। আমার বন্ধু পত্নীটি ভাল। আমার মত উঠকো বন্ধু বাসায় যখন তখন হাজির হলেও বিশেষ বিরক্ত হয় না।

তাদের এখনো বাচ্চা কাচ্চা হয়নি। হয়ত তারা এখনই নিতে চাচ্ছে না। তবে বাসায় ছোট্ট কিশোরী বয়সী একটা কাজের মেয়ে আছে, নাম দুলু। তাকে তারা দুজনেই যথেষ্ট আদর করে।

কিরে, তোদের সব চামচই এ রকম নাকি?

রাতে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে আমি একটি অদ্ভুতভাবে বাঁকানো চামচ হাতে নিয়ে বললাম। চঞ্চল মনে হল বিরক্ত বা সঙ্কিত মুখে তাকাল স্ত্রী নিপার দিকে।

আজ আবার শুরু হয়েছে?

boighar.com

হুঁম্, সকাল থেকে।

নিপা প্রায় ফিস ফিস করে বলে। আমার বন্ধুটি অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকায়। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই তাদের দিকে 'ব্যাপারটা কী?'

ব্যাপার গুরুতর। দুলু মেয়েটির মধ্যে মাঝে মধ্যে কিছু একটা 'ভর' করে। যেমন আজ সকালে করেছে। তখন সে কোনো কাজকর্ম করে না বা করতে পারে না। রান্নাঘরের এক কোনায় দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে গুনগুন করে কিছু একটা বলতে থাকে। আর দুলতে থাকে। সে সময় তার আশেপাশে থাকা স্টিলের জিনিসপত্র অদ্ভুতভাবে বেঁকে যায়।

বলিস কী! শুনে আমার কলজে কেঁপে ওঠে।

রান্নাঘরে যা নিজের চোখে দেখে আয়। চঞ্চল বলে।

আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম ওদের রান্নাঘরের দিকে। ফ্ল্যাট বাড়ির অতি আধুনিক রান্নাঘর। আমি উঁকি মেরে দেখি উঁচু চুলার পাশে নিচে চুপ করে বসে আছে দুলু। দু'হাতে দু'হাঁটু চেপে ধরে মাথাটা নিচু করে সে গুন গুন করে কী সব বলছে সুর করে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তার চার পাশেই পড়ে আছে অদ্ভুতভাবে বাঁকা একটা সসপ্যান, গোটা কয়েক ছোট বড় চামচ, ছুরি। সবই অদ্ভুতভাবে বাঁকা। আমি নাম ধরে ডাকলাম।

দুলু! এই দুলু!!

আশ্চর্য। মুখ তুলে তাকাল দুলু। নিষ্পাপ একটা মুখ। স্বাভাবিক চেহারা। চোখের মণি দুটো একটু অস্থির। একটু যেন লালচে। তার কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো।

দুলু তুমি ভাল আছ?

আমি বলি।

হ্যাঁ ভাল আছি। বলে সে মিষ্টি করে হাসল। তার হাসি দেখে আমার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। এমন ভয়ঙ্কর হাসি একটা বাচ্চা মেয়ে কখনোই হাসতে পারে না। এটা অন্য কারো হাসি, অন্য কেউ। ওর ভিতর অন্য কেউ আশ্রয় নিয়েছে।

আমি চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিরে এলাম ডাইনিং টেবিলে। চঞ্চল আমসি মুখে বসে আছে। নিপা একটু দূরে ডিপ ফ্রিজের ভিতরে কিছু একটা খুঁজছে।

দুলুর এ অবস্থা ক'দিন থাকবে?

ঠিক নেই। দু-চার দিন।

মেয়েটাকে তোরা কোথা থেকে এনেছিস?

দেশের বাড়ি থেকে।

তখন এই সমস্যা জানতি?

না।

কোনো ডাক্তার-টাক্তার?

এক সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি।

সাইকিয়াট্রিস্ট কি বলল?

বলল...

কী বলল শোনা হল না। ঝন ঝন করে একটা শব্দ এল রান্নাঘর থেকে। ছুটে গেলাম আমরা তিন জনই। সারা রান্নাঘরে ভাঙ্গা গ্লাস, বাঁকা চামচ, ছুড়ি ইত্যাদি ছড়ানো ছিটানো আগের মতই, শুধু বোধ হয় একটা গ্লাস ভেঙ্গেছে নতুন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়– ঘরে দুলু নেই।

দুলু? চিৎকার করল নিপা।

দুলু কোথায় গেল? তাই তো দুলু নেই এখানে, দু'সেকেন্ডে আগেও ছিল। ঠিক তখনই আমার চোখ গেল রান্নাঘরের সিলিংয়ের দিকে। যাকে বলে...একদম জমে গেলাম। হৃদপিণ্ডের অলিন্দ-নিলয়ের সব শুদ্ধ-অশুদ্ধ রক্ত যেন ঝট করে আমার সমস্ত শরীর জুড়ে দৌড়াল...এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, বেশ কয়েক বার।

কী দেখলাম আমরা! এ কী দেখছি!! চঞ্চলের চোয়াল ঝুলে গেছে, হা করে দেখছে। নিপা দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মেঝেতে। দুলু নামের মেয়েটি যে ভাবে ঘরের কোনায় বসে ছিল, ঠিক সে ভাবে বসে আছে রান্নাঘরের সিলিংয়ের কোনায়। তাও কী সম্ভব? মধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কাজ করছে না? আমার ভয় হল মেয়েটি যদি হঠাৎ নিচে পড়ে। আমি ছুটে গেলাম ঠিক তার নিচে। যেন সে আছড়ে পড়লে ক্রিকেট বলের মতো ক্যাচ ধরে ফেলে ওকে বাঁচাব। চঞ্চল কী বুঝলো– ছুটে গিয়ে একটা চাঁদর নিয়ে এল। আমরা দুজন চাদরটা টান টান করে ধরলাম ঠিক তার নিচে। যেন পড়লে চাঁদরের উপর আছড়ে পড়ে। এমন সময় দেখা গেল দুলু নেমে আসছে। ঐ রকম বসা অবস্থায় উল্টো হয়ে নেমে আসছে। খুব আস্তে কিন্তু নেমে আসছে। সে নামছে...নামছে।

boighar.com

দুলু চাদর স্পর্শ করার আগেই তাকে জাপটে ধরে ফেললাম আমরা। আর তখনই দুলু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'খালাম্মা, আমার ক্ষুধা লাগছে।'

দুলুকে খাবার দেয়া হল। সে খুব স্বাভাবিকভাবে খেল। যেন কিছুই হয়নি। নিপা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। নিপা আস্তে করে বলে,

কিরে দুলু তোর কী হয়েছিল?

কী জানি কইতে পারি না... কী একটা যেন...

কী একটা যেন?

ঐ ধরেন সন্ধ্যার সময় ঐ জানালাটার ধারে গেছি, দেখি জানালার ধারের বড়ই গাছটার উপর কালো মতন কী একটা বইসা আছে। মুখটা বিলাইয়ের মতন... আবার হাত পা মানুষের মতন...

তারপর?

তারপর জিনিসটা আমার দিকে লাফ দিল...আর যায়?, তারপর আর কিছু মনে নাই... কিছু কইতে পারি না।

কোন জানালাটা?

ঐ যে দক্ষিণ দিকের জানালাটা...

চঞ্চল পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় দক্ষিণ দিকের জানালাটার দিকে। এ বাসার প্রতিটা জানালায় একটা করে গাছ দাঁড়িয়ে আছে, মাটি থেকে উঠে আসা গাছগুলো তিন তলায় এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শেষ হয়েছে। দক্ষিণ দিকের জানালাটার পাশে বড়ই গাছটা খুব বেশি ঝাঁকড়া আর ঘন। চঞ্চল বোধ হয় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করছে।

জানালাটা বন্ধ করে ওখান থেকে চলে আসো তো। নিপা চেঁচিয়ে বলে।

বাধ্য ছেলের মত চঞ্চল নিপার কথা শুনলো। জানালাটা সে বন্ধ করলো না কিন্তু চলে এল। ডাইনিং টেবিলে তখন চা খাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। চঞ্চল আমার মুখোমুখি বসল। চঞ্চল একটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো চামচ তুলে নিল আলগোছে। নিপা দুলুকে নিয়ে গেছে শুইয়ে দিতে। মেয়েটার এখন ঘুমানো দরকার। আমি বললাম।

চঞ্চল দুলুকে নিয়ে কিছু ভাবছিস? ভালো কোনো ডাক্তার...

চঞ্চল কোনো কথা বলল না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে অদ্ভুতভাবে বাঁকানো চামচটার দিকে। আর কী আশ্চর্য– আমি দেখি, কই চামচ তো বাঁকা না, একদম সোজা হয়ে গেছে আগের মত। আমি অবাক হয়ে তাকালাম। চঞ্চল হাসল। ঠিক সেই হাসিটা– রান্নাঘরে দুলু আর দিকে তাকিয়ে যেভাবে হেসেছিল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখি চঞ্চলের চোখ দুটো আস্তে আস্তে রক্তাভ হয়ে উঠছে। সে আরেকটি বাঁকা চামচ উঠিয়ে নিল। আর কী আশ্চর্য– আমার চোখের, সামনে বাঁকা চামচটি আস্তে আস্তে সোজা হয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে উঠলাম– 'নিপা! নিপা!!'

boighar.com

ধলা

সন্ত্রাসী ধলাকে ক্রস ফায়ারে মারা হয়েছে। যথারীতি তাকে নিয়ে র‍্যাব সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধারে গেলে তার পক্ষের লোকজন আচমকা গুলি চালায়। তখন ক্রস ফায়ারে পড়ে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ধলা মারা পড়ে। সেই চিরন্তন ভাঙ্গা রেকর্ডের এক মিথ্যা গল্প– মিথ্যাকে বারবার বললেও সত্যের মত শোনায়। এখন যেমন মনে হচ্ছে কে জানে হয়ত হতেও পারে এনকাউন্টারে পড়েই ধলা মারা গেছে।

আমি ধলার গ্রামেরই ছেলে। একসঙ্গেই আমরা বেড়ে উঠেছি। তার মত সন্ত্রাসী হয়ে উঠিনি হয়ত। তবে মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি। একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছি। একসঙ্গে কত না স্মৃতি... সেই গল্প থাক, এখন শুরু হয়েছে অন্য গল্প... তার লাশ পড়ে আছে তার বাড়ির সামনের উঠানে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ধলা এখন নিঃসহায় হয়ে পড়ে আছে তার বাড়ির উঠানে। কিন্তু তাকে কবরস্থ করার কেউ নেই। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তার লাশ আসছে শুনে আগেই গৃহ ত্যাগ করেছে। ধলার বাবা ধলাকে আগেই ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। সেই সূত্রেই বোধ হয় এই স্বেচ্ছা পলায়ন।

এমতাবস্থায় আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু, খেলার সাথী ধলাকে আমরাই কবরস্থ করব। হোক না বিপথগামী সন্ত্রাসী, এক সময় তো আমাদের সঙ্গী ছিল সে।

আমরা মোট ছ'জন ধলার লাশ খাটিয়ায় তুলে রওনা হলাম। যেতে হবে দু'কিলোমিটারের মত রাস্তা হেঁটে। শিয়ালমারা জঙ্গলে। এক সময় শিয়াল মারা হতো বলেই হয়ত জঙ্গলের নাম হয়েছে শিয়ালমারা। সেখানে অঘোষিত একটা গোরস্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এখানে কাউকে করস্থ করে না। দূর দূরান্ত থেকে আসা রহস্যময় মৃত মানুষদেরই এখানে কবর

বইঘর.কম

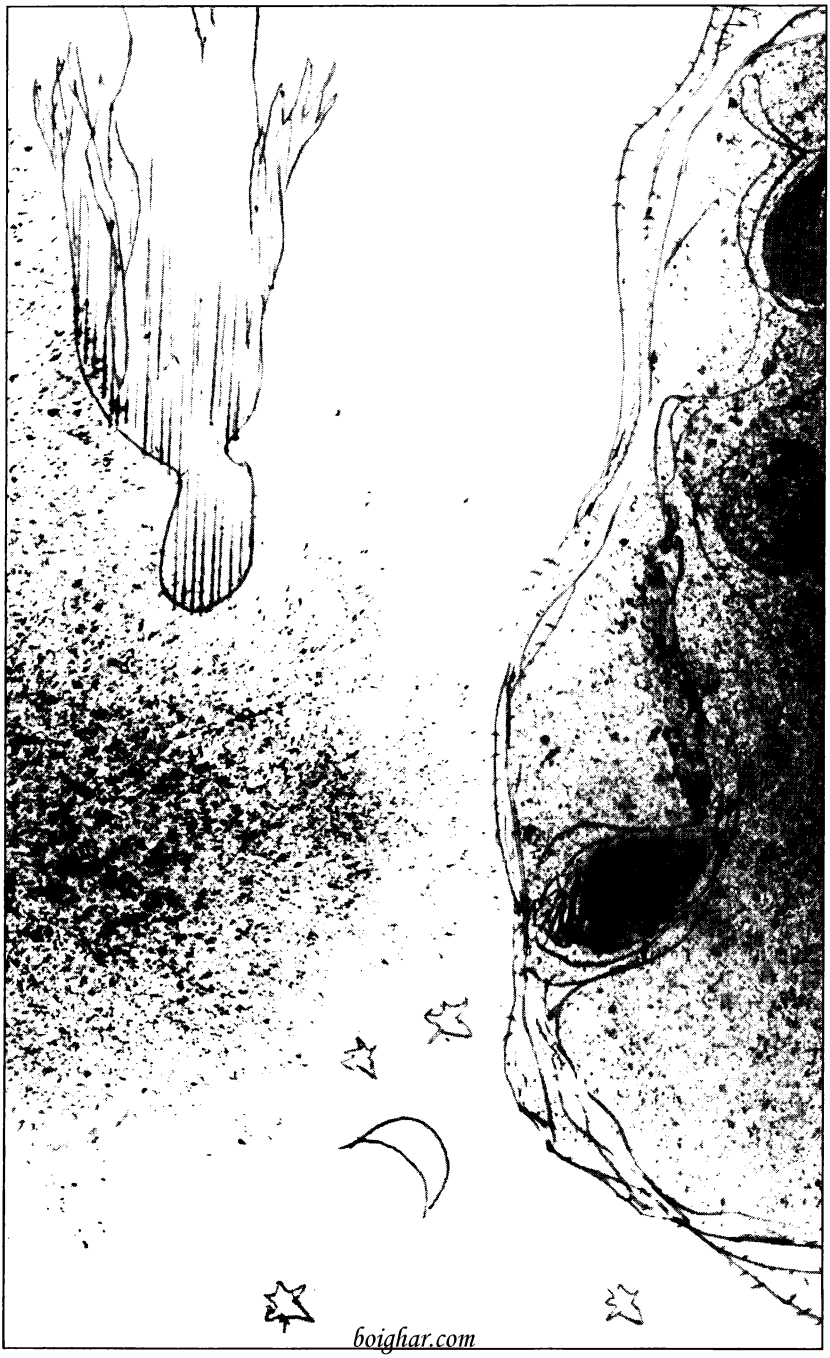

boighar.com

দেয়া হয়। ধলা তো সেরকমই একটা লাশ এখন।

লাশটা কাঁধে নিয়েছি আমি, মনা, কাবুল আর সিরাজ। পিছে পিছে আসছে সদরুল আর জাভেদ। ওদের হাতে কোদাল, বাঁশ, চাটাই, কবর দিতে যা যা লাগে।

খাটিয়াটা আনা হয়েছে মসজিদ থেকে। খাটিয়াটা এমনিতেই অসম্ভব ভারী। আর আমাদের ধলাও লম্বা চওড়া তেজি পুরুষ ছিল। এখন বেচারা নিঃসহায় আমাদের কাঁধে! সদরুল আর জাভেদ হ্যারিকেন হাতে আগে আগে চলছে। পিছনে লাশবাহী আমরা চারজন। শুরুতে কিছু কৌতূহলীলোক আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল, ধোয়াশ খালের ছোট্ট কাঠের সাঁকোটা পার হবার পর তারা কেটে পড়ল। এই ছোট্ট সাঁকোটার পরই যেন প্রকৃতির চেহারা বদলে গেছে! নিশাচর প্রাণীর আনাগোনাও যেন বেশি। বাড়িঘরও কম। চারদিকে শুনশান নীরবতা। প্রকৃতি রহস্যময় কারণে যেন হঠাৎ করে এই সাঁকোর পরে চুপ মেরে গেছে। কি কারণে কে জানে।

আমরা যখন শিয়ালমারা জঙ্গলে ধলার লাশ নিয়ে পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা অতিক্রম করে রাত সাতটার উপরে বাজে। অন্ধকারে গোরস্থান খুঁজে বের করে ধলার লাশ নামানো মাত্র সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামল। ভাগ্যিস একটা ছাতা আনা হয়েছিল। সেটা দিয়ে হ্যারিকেনটা আড়াল করা হল কোন রকমে।

সদরুল আর জাভেদ কোদাল শাবল দিয়ে ধুপধাপ কবর খুঁড়তে লেগে গেল। আর আমরা লাশবাহী চারজন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। পাশেই খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ধলা, সাদা কাফনে মোড়ানো। অবশ্য কাফনটা তখন আর সাদা ছিল না। ক্রমশই লাল হয়ে উঠছিল। তার বুকের আর পেটের গুলির ক্ষতগুলো দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছিল।

আচ্ছা, ধলা কি বিয়া করছিল? প্রশ্ন করে সিরাজ।

না। আমি বলি।

ক্যান? মিনারা নামের একটা মেয়ের সাথে না...

মিনারার সাথে তার ভালবাসা ছিল তবে পরে আর মিনারা তাকে বিয়ে করে নাই... সেই দুঃখেই সে সন্ত্রাসীর খাতায় নাম লেখায়।

না। ঠিক বললি না...

কেন?

সন্ত্রাসী হইছে সে আরো অনেক পরে।

সেই মিনারা এখন কোথায়?

কে জানে?

আলাপ আলোচনার এই সময় সদরুল চেঁচিয়ে ওঠে, 'কমপ্লিট... এখন লাশ নামানো যাইতে পারে।'

আমরা চার জন উঠে গিয়ে কবর পর্যবেক্ষণ করলাম। আমার মনে হল কবরটা যেন একটু বেশি গভীর আর বড় করা হয়েছে। বৃষ্টির কারণে বারবার ভিতরে পানি জমে যাচ্ছে বলে আমরা তাড়াহুড়া করছিলাম। বারবার পানি জমে যাচ্ছিল, সেঁচতে হচ্ছিল।

কিন্তু কবরে কে নামবে, যে লাশটা ধরে মাটিতে রাখবে– এটা নিয়ে প্রথম সমস্যা দেখা দিল, কেউ কবরে নামতে চাচ্ছে না। এ ওকে ঠেলে, ও একে ঠেলে, শেষ পর্যন্ত আমিই নামলাম।

আরে। আমি বলি তুইই পারবি...আমরা উপর থেকে ধরব।

ওরা লাশটা ধরা ধরি করে আনছে, আমি কবরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি। আমার মাথাটা শুধু বের হয়ে আছে বাইরে। চার দিকে অজস্র গাছপালা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির শব্দ। আর হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাসের ঝাপটা...সব মিলিয়ে একটা অতিন্দ্রিয় পরিবেশ। কোন কারণ ছাড়া আমার গা টা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ভয়ে না শীতে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তখনই ভাবনাটা আমার মাথায় এল। ওরা লাশটা আনতে এত দেরি করছে কেন। আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি কবরের ভিতর প্রায় গলা পর্যন্ত। আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা ধরাধরি করে লাশটা আনছে... কিন্তু কই আসছে না তো! আর ঠিক তখনই আমার পায়ে একটা স্পর্শ পেলাম। ঝপ করে নিচে তাকালাম। আমার বুকের রক্ত হীম হয়ে গেল। আমার

boighar.com

মনে হল আমার ঘাঁড়ের কাছের সমস্ত চুলগুলো সর সর করে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ স্পষ্ট দেখলাম কবরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ধলা। গায়ে কাফনের কাপড় নেই, শার্ট প্যান্ট পরা, বুক আর পেটটা রক্তাক্ত, তার মাথাটা আমার পায়ের কাছে। সে এক হাতে আমার পা ধরে ফিস ফিস করে বলল, "দোস, আমারে কবর দিস না, হাসপাতালে নে।"

আমার কি হল আমি কবরের ভিতর নিচু হয়ে সাহস করে ধলার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরলাম। থর থর করে কাঁপছে তার ভেজা শীতল হাতটা। ধলা আবার ফিস ফিস করল..."প্লিজ, আমাকে কবর দিস না।"

তুই মরিস নাই?

না। বিশ্বাস কর।

এই সময় 'এই ধর ধর...' শুনে উপরে তাকালাম। দেখি ওরা পাঁচজন মিলে কাফনে জড়ানো ধলাকে এগিয়ে ধরেছে আমার দিকে। কি আশ্চর্য তখনো কবরে শার্ট প্যান্ট পরা ধলা এক হাতে আমার একটা পা চেপে ধরে আছে আর আমার বন্ধুরা কাফনে মোড়ানো মৃত ধলাকে ছেড়ে দিয়েছে আমার হাতে। আমি ওদের পরিস্থিতিটা বলতে যাব তার আগেই ধলার শরীরের ভর পুরোটা আমার উপর ছেড়ে দিল ওরা। আমি মৃত ধলাকে ধীরে ধীরে আস্তে করে জীবিত ধলার উপর ছেড়ে দিতেই দেখলাম নিচে আর কেউ নেই। একজন ধলাই শুয়ে আছে, সে মৃত। সাদা কিন্তু রক্তাক্ত কাফনে মোড়নো।

এভাবে কতক্ষণ গিয়েছে আমি বলতে পারব না। একটা ঘোরের মধ্যে ঠিক কতটা সময় গিয়েছে... আমি কী করেছি... তাও জানি না। খালি মনে হচ্ছিল কাফনে মোড়ানো মৃত ধলার নিচে কি জীবিত ধলা কাতরাচ্ছে? আমি যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ উপর থেকে ওরা একসঙ্গে তাড়া দিল, 'উঠে আয়। দেরি করছিস কেন? বাঁশ চাটাইতো দেয়া হয়েছে।' বাঁশ চাটাই দেয়া হয়েছে। কখন দিল কে দিল? আমার মাথার ভিতরটা কাজ করছিল না। আমার কি মনে হল হঠাৎ নিচু হয়ে প্রশ্ন করলাম–

ধলা, বেঁচে আছিস?

ধলা কোন উত্তর করল না। মৃত মানুষ কথা বলে না। ওদিকে উপর থেকে ওরা চেঁচাল, 'উঠে আয় জলদি। কার সাথে কথা বলিস?' আমি উঠে আসতে যাব তখনই মনে হল আমি উঠে আসতে পারছি না। কেউ যেন আমাকে ধরে রেখেছে। যেন ধলাই আমার পা চেপে ধরে আছে আর ফিস ফিস করে বলছে, 'দোস, কবর দিস না...হাসপাতালে নে আমারে।' আমি এবার ভয় পেলাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'তোরা আমাকে টেনে তোল। আমি উঠতে পারছি না।' ওরা দ্রুত ছুটে এসে আমার হাত ধরে হেঁচকে টান দিয়ে উঠিয়ে নিল।

খুব দ্রুতই আমরা মাটি দিয়ে ঢেকে ফেললাম ধলাকে। যত দ্রুত ঢেকে ফেলা যায় ওকে। যত দ্রুত এই আলোকিত পৃথিবী থেকে ওকে মুছে ফেলা যায়।

ফেরার পথে শূন্য খাটিয়া আর কাঁধে নিলাম না। সবার আগে কাবুল তার হাতে হ্যারিকেন, মাথায় ছাতা। তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। চারজনের কাঁধে খাটিয়া। খাটিয়া মসজিদে পৌঁছে দিতে হবে। সবশেষে আমি। কবরের ভিতরে ধলার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তখনো আমি কাউকে কিছু বলি নি। এটা নিয়েই ভাবতে ভাবতে একটু ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম বোধহয়। ধোয়াশ খালের সাঁকোটার কাছে আসতেই আমার মনে হল কেউ একজন আমাকে অনুসরণ করছে। ওরা খালটা পার হয়ে গেল। আমি তখনো পার হই নি। দেখি ধলা সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে। সেই শার্ট প্যান্ট পরা, বুকে পেটে রক্তের দাগ নেই। মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও নেই। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

বৃষ্টির ঝাপটার সাথে প্রবল বাতাসে ধলার সাদা শার্টের কলার সপ সপ শব্দ করে নড়ছে। তার ভেজা চুল সাপটে আছে কপালে। হ্যাঁ, আমাদের সেই ছেলেবেলার বিপথগামী বন্ধু ধলাই দাঁড়িয়ে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। তাকে দেখে কে বলবে এই একটু আগে আমরা ক'জন তাকে চার পাঁচ হাত মাটির নিচে রেখে এসেছি?

কি হল? তোরা দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান?

boighar.com

অন্য বন্ধুদের চিৎকার শুনে আমার সম্বিৎ ফিরল, সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে আছি আমি একা। আর কেউ নেই আশেপাশে।

(এই ঘটনাটি আরেকজনের কাছ থেকে শুনে উত্তম পুরুষে আমি নিজেই লিখেছি। –লেখক)

বইঘর.কম

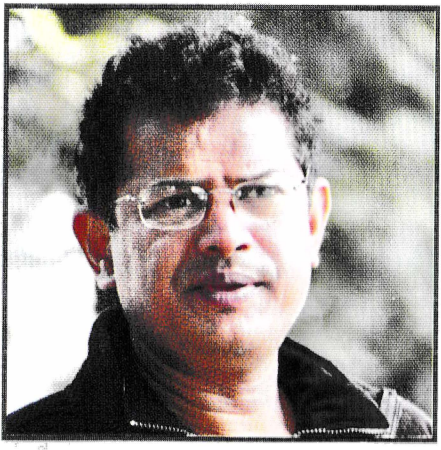

আহসান হাবীব। জন্ম– ১৯৫৭ সিলেটে। পড়াশুনা– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে মাস্টার্স। জীবনের প্রথম চাকরী ব্যাংকে। তারপর চাকরী ছেড়ে কার্টুনিস্ট হিসেবে জীবন শুরু। তেত্রিশ বছর ধরে কার্টুন আঁকছেন। পাশাপাশি শখে লেখালেখি করতে গিয়ে এখন পুরো দস্তুর লেখক। জোক্স তার প্রিয় বিষয়। নিজেকে গ্র্যান্ড ফাদার অফ জোক্স বলে ঠাট্টা করেন।

শিক্ষিকা স্ত্রী আফরোজা আমিন, কন্যা এষা আর ভাগনী তিথিকে নিয়ে তার নিজস্ব জগৎ।

boighar.com